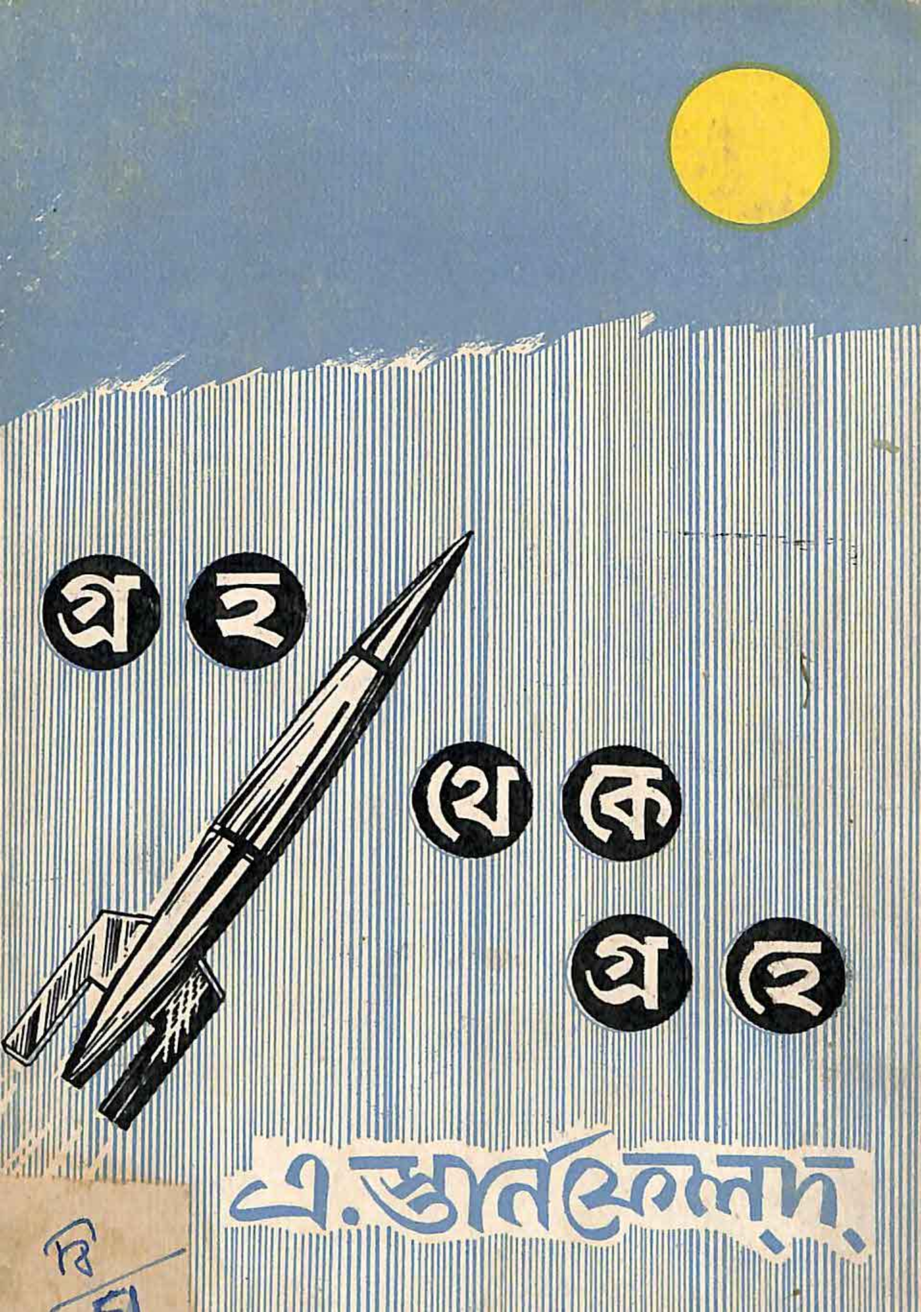

গ্রহ থেকে গ্রহ
এ. স্তের্নফেল্দ

গ্রহ থেকে গ্রহে



গ্রহ থেকে গ্রহে

এ. স্তার্নফেল্‌দ্‌

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫।১বি, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রথম বাংলা সংস্করণ

নভেম্বর : ১৯৫৭

মস্কোস্থ বৈদেশিক ভাষায় সাহিত্য প্রকাশনা-ভবন হইতে প্রকাশিত
ইংরেজী সংস্করণ

Interplanetary Travel : 1957

॥ রুশভাষা হইতে ইংরাজী অনুবাদ ॥

ওয়াই. ত্রিউমফভ্

॥ ইংরাজী হইতে বাংলা অনুবাদ ॥

অমল দাশগুপ্ত

॥ প্রচ্ছদ ও বর্ণলিপি-শিল্পী ॥

অমূল্য দাস

দাম : এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

প্রকাশক : শ্রীঅখিলচন্দ্র নন্দী, পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মুদ্রাকর : শ্রীস্বকুমার চৌধুরী, বাণী-শ্রী প্রেস, ৮৩।বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

মহাশূন্যে পর্যটন সম্পর্কে পুরাকাহিনী ও বিজ্ঞান··· ১৭—২৩

ব্যোমযান ··· ২৪—৪৫

পৃথিবী ছাড়িয়ে ছুট দেবার সমস্যা
ব্যোমযানের গোড়ার কথা—রকেট
ব্যোমযানের গড়ন

ব্যোমযান প্রসঙ্গে ··· ৪৬—৬৩

যাত্রা-শুরু
পাড়ি
ব্যোমযানে জীবনযাত্রা
নভোচারণার বিপদ
অবতরণ

মানুষের তৈরি উপগ্রহ ···· ৬৪—৭১

গঠন
কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার

বিষয় পৃষ্ঠা

মহাশূন্যে পর্যটন ... ৭২—৯৭

চন্দ্রে যাত্রা

মঙ্গলগ্রহে যাত্রা

শুক্রগ্রহে যাত্রা

অন্যান্য গ্রহে যাত্রা

পরিশিষ্ট ... ৯৮—১০৩

বাংলা অনুবাদকের ভূমিকা

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। স্মরণীয় এইজন্য যে, এই দিনটিতে মানুষের তৈরী একটি উপগ্রহ পৃথিবীকে পাক খেয়েছে। অর্থাৎ, এতদিন পর্যন্ত চন্দ্রই ছিল পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ; এই দিনটি থেকে আর একটি শিশুচন্দ্র তৈরী হয়েছে মানুষের হাতে। এতদিন পৃথিবীর আকাশে চন্দ্রকে চলতে হয়েছিল নিতান্তই একা, এবারে মানুষের হাতে তৈরী হয়েছে চন্দ্রের সহযাত্রী বা স্পুটনিক। তার চেয়েও বড়ো কথা, এতদিন মানুষের চলাফেরা সীমাবদ্ধ থেকেছিল এই একটিমাত্র গ্রহের মাটিতে-জলে-বাতাসে, এবারে মানুষের অভিযান শুরু হয়েছে গ্রহ থেকে গ্রহের সীমাহীন মহাশূন্যে। পৃথিবীর ইতিহাসে এবং মানুষের ইতিহাসে বিপুল সম্ভাবনাময় এক নতুন যুগের শুরু এই দিনটি থেকে।

এই নতুন যুগকে বলা চলে নভোচারণার যুগ। আমাদের এই সৌরমণ্ডলে ন'টি গ্রহ আছে। এই ন'টি গ্রহের সীমাহীন বিস্তৃতিতে চলাফেরা করবে আগামী দিনের মানুষ। জুলে ভার্নে থেকে এইচ. জি. ওয়েলস্ পর্যন্ত মানুষের কল্পনা যে-ব্যাপারকে সম্ভব করে তুলতে পারেনি, বিশ শতকের মধ্য পাদে মানুষের কৃতিত্ব তাকে বাস্তব করে তুলেছে। আজ আর এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে আগামী

কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর মানুষের পদচিহ্ন পড়বে চন্দ্রে বা মঙ্গল-গ্রহে বা শুক্রগ্রহে এবং আগামী কয়েক যুগের মধ্যে গোটা সৌরমণ্ডলটাই হয়ে উঠবে মানুষের আপন ঘর। দু'মণ ওজনের আর বাইশ ইঞ্চি ব্যাসের একটা গোলককে পৃথিবীর মাটি থেকে কয়েক-শো মাইল উঁচুতে উঠিয়ে বিশেষ এক কক্ষপথে ছুট দেওয়ানো গেছে বলেই এত বড়ো একটা স্পর্ধার কথা কেন বলা যাচ্ছে—তার জবাব হচ্ছে সোভিয়েত বিজ্ঞানীর লেখা এই বইটি।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা একমাস সময়ের মধ্যেই দু-দুটো স্পুটনিককে আকাশে তুলেছেন। প্রথম স্পুটনিকটির ব্যাস ৫৬ সেন্টিমিটার (এক সেন্টিমিটার হচ্ছে এক-ইঞ্চির পাঁচ-ভাগের প্রায় দু-ভাগ এবং ওজন ৮৩·৬ কিলোগ্রাম (এক কিলোগ্রামে ২·২০৪৬ পাউণ্ড, অর্থাৎ মোটামুটি এক-সের)। এই স্পুটনিকটি একটি উপবৃত্তাকার কক্ষে পৃথিবীকে পাক খাচ্ছে। কক্ষটি উপবৃত্তাকার বলেই পৃথিবী থেকে স্পুটনিকের দূরত্ব সব সময়ে সমান নয়; কখনো খুব কাছে, কখনো খুব দূরে। সবচেয়ে দূরে থাকার সময়ে পৃথিবী থেকে স্পুটনিকের দূরত্ব হয় প্রায় এক হাজার কিলো-মিটার (এক কিলোমিটারে ০·৬২১৪ মাইল, অর্থাৎ এক-মাইলের আট ভাগের প্রায় পাঁচভাগ)।

প্রথম স্পুটনিকের কক্ষ সম্পর্কে বিশেষ করে জানার আছে। এই কক্ষটি পৃথিবীর বিষুব-সমতলের সঙ্গে ৬৫° কোণাকুণি। পুরোপুরি ৯০° হলে কক্ষটি পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবিন্দু দুটির ওপর দিয়ে যেত। তা হয়নি। মেরুবিন্দু থেকে ২৫° তফাতে, অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের মেরু-বৃত্তের প্রায় ওপর দিয়ে কক্ষটিকে রচনা করা হয়েছে।

পৃথিবীকে পুরো একটা পাক দিতে স্পুটনিকের সময় লাগছে ৯৫ মিনিট। আবার পৃথিবী নিজেও লাটুর মতো পাক খেয়ে চলেছে; ২৪ ঘণ্টায় পুরো এক পাক, অর্থাৎ ৩৬০°। তার মানে এই ৯৫ মিনিট সময়ের মধ্যে পৃথিবী প্রায় চব্বিশ ডিগ্রির মতো পাক খায়। তাহলে দুয়ে মিলিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াবে এই যে পৃথিবীর একই এলাকার ওপর স্পুটনিক পরপর দু-বার পাক খাবে না; স্পুটনিকের এক-একটি পাকে পৃথিবীর এক-একটি এলাকা।

কৃত্রিম উপগ্রহকে এ-ধরনের একটি কক্ষে ছুট দেওয়ানো খুবই দুরূহ ব্যাপার। সহজেই অনুমান করা চলে, কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরির সবচেয়ে সহজ কক্ষ—পৃথিবীর বিষুবরেখা বরাবর, বা সাদা কথায় পৃথিবীর পেট বরাবর, উপগ্রহকে ছুট দেওয়ানো। আমরা জানি, পৃথিবীর উপরিতলে বিষুবরেখার কোনো বিন্দু ঘণ্টায় এক হাজার মাইলের কাছাকাছি বেগে পাক খাচ্ছে (কারণ পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় একবার পাক খায় এবং বিষুবরেখার কোনো বিন্দু এক পাকে প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল পার হয়ে আসে)। সুতরাং উপগ্রহটি যদি বিষুবরেখা বরাবর পাক দিত তাহলে পৃথিবীর পাক খাওয়ার বেগটুকু উপগ্রহটির বেগের পক্ষে একটা সঞ্চয় হিসেবে দেখা দিত এবং হিসেব ও মাপজোখের ব্যাপারটাও হয়ে যেত অনেক সহজ। কিন্তু অন্যদিকে মস্ত একটি অসুবিধে ছিল। উপগ্রহটি পৃথিবীর একই এলাকার ওপর দিয়ে বরাবর পাক খেয়ে চলত, ফলে উপগ্রহটির পক্ষে পৃথিবীর একটি বিশেষ এলাকা ছাড়া অন্য কোনো এলাকাকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হত না।

দ্বিতীয় স্পুটনিককে যদিও অনেক বেশি উঁচুতে তোলা হয়েছে, কিন্তু

প্রথম স্পুটনিকের মতোই দ্বিতীয় স্পুটনিকের কক্ষটিও বিষুব-সমতলের ৬৫° কোণাকুণি। দ্বিতীয় স্পুটনিকের সঙ্গে যে-সব জটিল যন্ত্রপাতি ও যে-কুকুরটিকে আকাশে তোলা হয়েছে তার মোট ওজন ৫০৮'৩ কিলোগ্রাম (প্রায় চোদ্দ মণ)। উপগ্রহটি পৃথিবী থেকে যখন সবচেয়ে দূরে সরে যায় তখন পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব হয় প্রায় ১৭০০ কিলোমিটার (প্রায় এক হাজার মাইল)। আর উপগ্রহটির চক্রবেগ (অর্থাৎ যে-বেগে ছুট দিলে এটি একটি উপগ্রহ হয়ে ওঠে, মহাশূন্যে উধাও হয়ে যায় না বা পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসে না) সেকেণ্ডে প্রায় ৮,০০০ মিটার (প্রায় পাঁচ মাইল)।

এই বিপুল পরিমাণ ওজনকে এই বিপুল উচ্চতায় তুলে এনে এই বিপুল চক্রবেগে ছুট দেওয়ানো বৈজ্ঞানিক দিক থেকে যে কতখানি দুরূহ তা পুরোপুরি অনুমান করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার এইসব দিক থেকে দুরূহ কাজটি আরো বেশী দুরূহ হয়েছে বিষুব-সমতলের ৬৫° কোণাকুণি কক্ষপথটি বেছে নেওয়ার জন্যে। অন্যান্য দেশের যেসব বিজ্ঞানী এ বিষয়ে গবেষণা করছিলেন তাঁরা সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের কাণ্ডকারখানা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। অথচ অস্বীকার করার উপায় নেই। দু-দুটি স্পুটনিক জলন্ত প্রমাণ হিসেবে আজো পৃথিবীকে পাক খেয়ে চলেছে। দিনের পর দিন এই দুটি স্পুটনিক থেকে পাঠানো বেতারবার্তা শোনা গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্রে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তাঁরা আরো কয়েকটি উপগ্রহ পৃথিবীর আকাশে তুলবেন।

তারপরে রকেট পাঠাবেন চন্দ্রে, মঙ্গলগ্রহে ও শুক্রগ্রহে। সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা উপগ্রহ তৈরীর ব্যাপারে যতোখানি সাফল্য অর্জন করেছেন তা থেকে বলা চলে, চন্দ্রে বা মঙ্গলগ্রহে বা শুক্রগ্রহে পাড়ি দেওয়া তাঁদের পক্ষে এখন আর কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়। ব্যাপারটা শুধু সময়সাপেক্ষ। কারণ, যে-হুটি স্পুটনিককে তাঁরা আকাশে তুলেছেন তাদের মারফৎ বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তর সম্পর্কে, মহাজাগতিক ও আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি সম্পর্কে, উল্কাপাতের বিপদ সম্পর্কে—এক কথায় মহাকাশ সম্পর্কে —যেসব খবরাখবর পাওয়া গেছে এবং আগামী দিনের উপগ্রহগুলো থেকে আরো যেসব খবরাখবর পাওয়া যাবে সেগুলোকে বিচার ও বিশ্লেষণ করা দরকার। অর্থাৎ, যাত্রার বাহন তৈরী; শুধু জেনে নিতে হবে—রাস্তার বিপদ-আপদকে ঠেকাবার জন্য কি কি সাজ-সরঞ্জাম চাই, আর কিভাবে তৈরী হতে হবে। এটুকু জেনে নেওয়া মানুষের পক্ষে খুব একটা শক্ত কাজ নয়।

সুতরাং যে দুটি স্পুটনিক মহাশূন্যে পৃথিবীকে পাক খেয়ে চলেছে তা আমাদের কাছে শুধু দুটি ধাতু-গোলক নয়, শুধু কতকগুলো মাপজোখ নেবার যন্ত্রপাতি নয়, শুধু দুটো 'উড়ন্ত গবেষণাগার' নয়—তা ছাড়াও তা হচ্ছে আমাদের কাছে এক নতুন যুগের প্রতীক, যেযুগে মানুষ প্রাণের স্ফুলিঙ্গকে ছড়িয়ে দেবে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে, এক বিশ্ব থেকে অন্য বিশ্বে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে এতদিন মানুষ এই একটিমাত্র গ্রহের চৌহদ্দির মধ্যেই চলাফেরা করতে বাধ্য হয়েছে—এই নতুন যুগে এতদিন পরে মানুষের এই বন্দীদশার শেষ।

'গ্রহ থেকে গ্রহে' বইটিতে সোভিয়েত বিজ্ঞানী স্তার্নফেল্‌দ্‌ এই নতুন যুগের চেহারা বিজ্ঞানের ছক্‌-কাটা হিসেবের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এই হিসেবের মধ্যে কোথাও কোনোরকম ফাঁক নেই। নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে পৃথিবী থেকে চন্দ্রে বা মঙ্গলগ্রহে বা শুক্রগ্রহে পাড়ি দিতে হলে কিভাবে ও কোন্‌ পথে রওনা হতে হবে আর কিভাবে ও কোন্‌ পথে ফিরে আসতে হবে। পথে যতোরকমের বিপদ-আপদের সম্ভাবনা আছে তার প্রত্যেকটিকে বিবেচনা করা হয়েছে। পথে যতোরকমের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বইটি পড়লে যেকোনো পাঠক বুঝতে পারবেন, গ্রহ থেকে গ্রহে পর্যটন শুরু করার পথে এখন আর বড়ো রকমের কোনো বাধা নেই।

আর একটি কথা। মহাশূন্যে পর্যটন করতে হলে যে ব্যোমযান ব্যবহার করতে হবে তার গোড়ার কথা হচ্ছে রকেট। ব্যোমযানের ছুট তৈরী হবে রকেটের সাহায্যে। আর রকেটের ছুট কিভাবে তৈরী হয় সেটা খুব ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। নিচে বিষয়টা আমি একটু স্পষ্ট করতে চেষ্টা করছি।

বন্দুক থেকে যখন গুলী ছোটে তখন বন্দুকের বাঁট কাঁধে ধাক্কা মারে। ইংরেজিতে একে বলা হয় বন্দুকের 'কিক্‌' বা লাথি। অর্থাৎ যেন বন্দুকের গুলী মানবের দিকে ছুটে যাবার সময়ে পিছনদিকে লাথি মেরে যাচ্ছে। 'ডেস্টিনেশন মূন' ফিল্‌ম-এর একটি দৃশ্য হয়তো অনেকেরই মনে আছে। রকেটের ছুট কিভাবে তৈরী হবে সেটা বোঝাবার জন্য ফিল্‌ম-এ দেখানো হয়েছে যে মিকি-মাউস শূন্য থেকে মাটির দিকে

করে বন্দুকের গুলী ছুঁড়ছে। যতোবার সে গুলী ছোঁড়ে ততোবার বন্দুক তাকে পিছনদিকে লাথি মারে। আর যতোই লাথি খায় ততোই সে শূন্যে ওঠে। এখন যদি কল্পনা করা যায় যে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বন্দুক মাটির দিকে তাক করে শূন্যে ঝুলানো আছে এবং সেই লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বন্দুক থেকে একসঙ্গে মাটির দিকে গুলী ছুটছে—তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? সেই লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বন্দুক শূন্যের দিকে যে লাথি মারবে তার প্রচণ্ডতা অনায়াসেই অনুমান করে নেওয়া চলে।

রকেটের ছুট এইভাবেই তৈরী হয়। অবশ্য সত্যিকারের বন্দুক ও গুলী রকেটে থাকে না—সে-জায়গায় প্রচণ্ড একটা রাসায়নিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয় আর বস্তুকণাগুলো বন্দুকের গুলীর মতোই ছুটে বেরিয়ে আসে। আর যেদিকে বস্তুকণাগুলো ছুটে বেরিয়ে যায় তার উল্‌টোদিকে থাকে প্রচণ্ড একটা লাথি—এই লাথির ঠেলাতেই রকেট শূন্যে ছুট দেয়।...এখানে একটা বিষয়ে খুব পরিষ্কার ধারণা করে নেওয়া দরকার। ঠেলা মানে এই নয় যে রকেট থেকে বেরিয়ে আসা বস্তুকণা বাইরের কোন কিছুকে ঠেলা মারছে আর সেই ঠেলায় রকেট ছুটছে; যেমন নৌকোর দাঁড় জলকে ঠেলা মারে আর সেই ঠেলায় নৌকো চলে। রকেটের ঠেলা খাওয়াটা এই ধরনের ঠেলা নয়। রকেটের ঠেলাটা তৈরী হচ্ছে রকেটের মোটরের ভেতরেই।

কাজেই রকেট সম্পর্কে যে-মূল কথাটা জেনে রাখা দরকার তা হচ্ছে এই যে রকেটের ছুট বাইরের কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করে না; হাওয়ার ভেতর দিয়েই ছুটতে হোক বা মহাশূন্য দিয়েই ছুটতে হোক—

রকেট ছুটবে নিজস্ব ঠেলার জোরে। আর রকেট সম্পর্কে দ্বিতীয় যে-কথাটা মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে এই যে, রকেটের মোটর থেকে যে গ্যাস বেরিয়ে আসে, বা যাকে বলা যায় রকেটের নিঃসরণ—তা যতো বেগে বেরিয়ে আসতে পারবে, রকেটের বেগও শেষ পর্যন্ত ততো বেশী হবে।

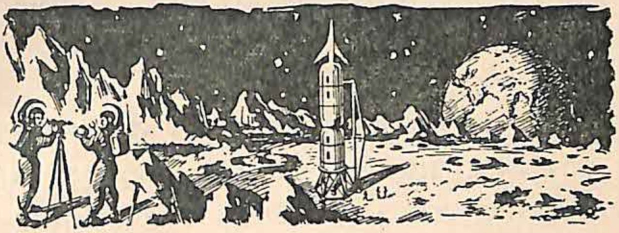
স্তার্নফেল্‌দ্‌ বিশেষ করে আলোচনা করেছেন তরল-জ্বালানির রকেটের কথা। পরমাণবিক রকেটের উল্লেখ করেছেন মাত্র। তরল জ্বালানির রকেটে একটা অসুবিধে হচ্ছে এই যে এ-ধরনের রকেটে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি মজুদ রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। মার্কিন বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে সোভিয়েতের দ্বিতীয় স্পুটনিকটিকে যদি তরল জ্বালানির রকেট ব্যবহার করে আকাশে তোলা হয়ে থাকে তাহলে কয়েক হাজার টন জ্বালানি মজুদ করতে হয়েছে। ব্যাপারটা খুবই অসুবিধের। অনেকেই অনুমান করেছেন যে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা কোনো নতুন ধরনের জ্বালানি আবিষ্কার করেছেন। এমনও হতে পারে, সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা স্পুটনিক দুটিকে আকাশে তোলার জন্য যে রকেট ব্যবহার করেছেন তা পরমাণবিক রকেট। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে, মহাশূন্যে পর্যটন করার ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো অসুবিধেটিকে জয় করা হয়েছে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যদিও এখনো স্পষ্ট করে বলেননি তাঁরা কি ধরনের রকেট ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁরা তার চেয়েও চমকপ্রদ আর একটি খবর দিয়েছেন। খবরটি হচ্ছে এই : সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা

এমন একটি রকেট তৈরি করতে চেষ্টা করছেন যা প্রায় আলোর বেগে ছুটবে। অর্থাৎ, সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে। রকেটটির নাম দেওয়া হয়েছে ফোটোন রকেট। খবরটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু দুটি স্পুটনিককে আকাশে উড়িয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে তাঁরা অবিশ্বাস্যকেও বাস্তব করে তুলতে পারেন। কাজেই তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া এই খবরটিও আগে থেকেই মেনে নেওয়া ভালো।

অর্থাৎ, আগামী যুগ যে কি বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে সে-সম্পর্কে এখন শুধু কল্পনা করা চলে। কিংবা মানুষের কল্পনাও হয়তো সেই বিপুল সম্ভাবনার একটা ছবি আঁকতে গিয়ে হার মেনে যায়।

অমল দাশগুপ্ত



মহাশূন্যে পর্যটন সম্পর্কে পুরাকাহিনী ও বিজ্ঞান

মহাশূন্যে পর্যটন। আগেকার যুগে তা ছিল নিতান্তই অলস কল্পনা। পৃথিবী ছাড়িয়ে মানুষের অন্যলোকে যাত্রা সম্পর্কে বা অন্যলোকের জীবদের পৃথিবীতে বেড়াতে আসা সম্পর্কে অজস্র পুরাকাহিনী আছে। বিশেষ করে গ্রীক পুরাণে তো এ-ধরনের কাহিনী বিস্তর। যেমন, ইকারাস-এর গল্প। ইকারাস তার পিঠে মোম দিয়ে পালকের ডানা লাগিয়েছিল। তারপর উড়তে উড়তে সূর্যের এত কাছাকাছি হাজির হয়েছিল যে সূর্যের তাপে মোম গলে গিয়ে ডানা খসে পড়ে আর ইকারাস সমুদ্রে পড়ে গিয়ে ডুবে যায়। আরেকটি গল্প আছে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার সম্পর্কে। তিনি চেয়েছিলেন ঈগলপাখি-টানা রথে চেপে স্বর্গে যাত্রা করতে। একটি চীনা পুরাকাহিনীতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে চীনাদের পূর্বপুরুষরা এসেছে চন্দ্র থেকে।

মধ্যযুগের সংস্কারাচ্ছন্ন সময়ে মানুষ নভোচারণা সম্পর্কে টুঁ শব্দটি করেনি, কারণ তা করলে পাদরিদের হাতে শাস্তি পাবার ভয় ছিল। এ-ব্যাপারে ব্যতিক্রম হচ্ছে ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ। এই মহাকাব্যের একটি প্রধান চরিত্র স্বর্গে গিয়েছিল।

পৃথিবী ছাড়িয়ে পাড়ি দেওয়া সম্পর্কে কল্পনাশ্রয়ী কাহিনী রচনায় মানুষ আবার মেতে ওঠে রেনেসাঁস যুগে এসে। তবে এবার আর পুরাকাহিনী নয়; প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে এল বিজ্ঞাননির্ভর আন্দাজ ও অনুমান।

সতেরো শতকে এসে প্রথম দেখা যাচ্ছে, শিল্পবিজ্ঞানের আওতার মধ্যে থেকেই নভোলোকের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। অবশ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা রচিত হয়নি।

ইংরেজ বিজ্ঞানী জন উইল্‌কিন্‌স্‌ তাঁর 'নূতন জগৎ ও গ্রহান্তর সম্পর্কিত নিবন্ধে' নভোচারণার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে আরো খানিকটা এগিয়েছিলেন ফরাসী ঔপন্যাসিক সাইরানো গু ব্যারজ্যারাক। মানুষ তখনো আকাশে উড়তে শেখেনি, সেই সময়েই তিনি বলেছিলেন যে রকেট ব্যবহার করে মহাশূন্যে পর্যটন করা সম্ভব। তিনি এতদূর পর্যন্ত এগিয়েছিলেন যে তাঁর পক্ষে একটি রকেটবাহিত ব্যোমযানের সহজতম নক্‌শার বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

উনিশ শতকে এসে দেখা যাচ্ছে, মহাশূন্যে পর্যটন সম্পর্কে খানকয়েক কল্পনাশ্রয়ী উপন্যাস লেখা হয়েছে। এসব উপন্যাসের কয়েকটি একেবারেই অবৈজ্ঞানিক। যেমন, জুলে ভার্নের উপন্যাসের নায়কদের কামান দেগে চাঁদের দিকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু লেখক একটা ব্যাপার একেবারেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। কামান দাগার সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাসের নায়কদের তালগোল পাকিয়ে অক্কা পাওয়া উচিত ছিল।

বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে এইচ. জি. ওয়েলস্‌ এবং রাশিয়ায় এ. বোগদানভ ও পরবর্তী কালে এ. তলস্তয় ও এ. বেলিয়াএভ

অন্যজগতের জীবন সম্পর্কে কল্পনাশ্রয়ী উপন্যাস লিখেছেন। পাঠক-সাধারণের কাছে এসব উপন্যাস অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে।

বিজ্ঞানীরাও মহাশূন্যে পর্যটন সম্পর্কে গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন কে. ই. সিওল্‌কোভস্কি।

মহাশূন্যে পর্যটন সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে বলা হয় নভোচারণবিদ্যা (astronautics)। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাকে যতোখানি মর্যাদা দেওয়া হয়, নভোচারণবিদ্যারও ততোখানি মর্যাদা দাবি করার অবিসম্বাদিত অধিকার আছে।

অন্যান্য ক্ষেত্রের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার সঙ্গে নভোচারণবিদ্যার ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যেমন, জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান বা সৌরমণ্ডলের গড়ন সম্পর্কে নিকোলাস কোপার্নিকাসের শিক্ষা—এসবকে বাদ দিলে নভোচারণবিদ্যার অস্তিত্বই থাকে না।

কোপার্নিকাস প্রমাণ করেছিলেন যে পৃথিবী এই বিশ্বের কেন্দ্র নয়, পৃথিবী সমেত সবক'টি গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। কি কি নিয়ম মেনে গ্রহগুলো ঘুরছে তা আবিষ্কার করেছিলেন জোহানেস কেপ্‌লার। আর নভোলোকের গতিবিধির মূল নিয়মগুলোর স্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছিলেন স্যার আইজাক্ নিউটন। একটি ছুটন্ত বস্তুর পক্ষে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ বা 'খোকা চাঁদ' হওয়া সম্ভব এবং পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যে ছুট দেওয়া সম্ভব—এসব কথাও তিনি বলে গিয়েছিলেন।

কোপার্নিকাসের শিক্ষা বা কেপ্‌লার ও নিউটনের সূত্র—নভোচারণ-বিদ্যার পক্ষে এসবের অপরিসীম গুরুত্ব আছে। কারণ, ব্যোমযানকে একটি জ্যোতিষ্ক হিসেবেও দেখা চলতে পারে এবং প্রত্যেকটি

জ্যোতিষ্ককে যেমন কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়, তেমনি মহাকাশে পাড়ি দেবার সময়ে ব্যোমযানকেও সেই একই নিয়ম অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে মেনে চলতে হবে।

জ্যোতির্বিদ্যা ও রকেট-বিদ্যার উন্নতির ফলেই নভোচারণবিদ্যার জন্ম।

রকেটের ইতিহাস সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। প্রাচীনকালে চীনারা বড়ো বড়ো উৎসবের সময়ে কামানের গোলার রকেট আকাশের দিকে ছুঁড়ত। মধ্যযুগে যুদ্ধের প্রয়োজনে রকেটও ব্যবহার করা হয়েছিল।

ধাপে ধাপে ছুট দেবার রকেটের নক্শা ও বিবরণ পাওয়া যায় ষোল শতকের শেষদিকে। আর পাখনা লাগানো রকেটের ছবি পাওয়া যায় সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে।

রুশদেশে রকেটের অনুশীলন শুরু হয় সতেরো শতকের গোড়ার দিকে। শুরু করেন অনিসিম মিখাইলভ। রুশদেশে প্রথম 'রকেট অনুশীলন সংস্থা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৮০ সালে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই সংস্থার প্রধান হিসেবে কাজ করেছিলে কে. আই. কন্স্তান্তিনভ। তিনি ছিলেন বিপ্লবের আগের রুশদেশের একজন দিকপাল রকেটবিজ্ঞানী। তাঁরই চেষ্টায় রাশিয়ার যুদ্ধ-রকেট অনেকখানি উন্নত হয়ে ওঠে। ১৮৮১ সালে এন. আই. কিবালচিচ্ একটি রকেটবাহিত যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন।

মহাশূন্যে রকেটের ছুট—এ-ব্যাপারে খুঁটিনাটি গবেষণা করেছিলেন বিখ্যাত রুশ-বিজ্ঞানী কে. ই. সিওল্কোভস্কি (১৮৫৭-১৯৩৫)। তরল জ্বালানী ব্যবহার করে রকেটকে ছুট দেওয়াবার পরিকল্পনা সবার আগে তাঁর মাথাতেই এসেছিল।

সিওল্‌কোভস্কির অনুগামীদের মধ্যে দু'জনের নাম উল্লেখ করা চলে —এফ. এ. সান্দার (১৮৮৭-১৯৩৩) ও ওয়াই. ভি. কোন্‌দ্রাতিয়ুক। শেষোক্ত জনের ১৯৪২ সালে মৃত্যু হয়েছে।

বিদেশী বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁদের দানে নভোচারণবিদ্যা বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন, রোব্যার এস্‌নো-পেল্‌তেরি (ফ্রান্স), হেরমান্‌ ওবের্ট ও সায়েঙ্গার (জার্মানি), রবার্ট এইচ. গডার্ড (আমেরিকা), এ. আঁনফ্‌ (ফ্রান্স), ডব্‌লিউ. লে, হালে (আমেরিকা), ওয়াই. স্টেমার (সুইজারল্যাণ্ড), ই. বার্গেস ও এ. ক্লার্ক (ব্রিটেন), এইচ. গার্টমান (এফ. আর. জি)। এছাড়া আছে গ্রহান্তর যাত্রার প্রতিষ্ঠানগুলি (যেমন ব্রিটেনের প্রতিষ্ঠান)।

তারপর থেকে রকেট-বিদ্যার প্রচণ্ড অগ্রগতি হয়েছে। কয়েকটি হিসেব দিলে এ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হবে। তিরিশ দশকে এক-ধাপের তরল-জ্বালানির রকেট তেরো কিলোমিটার (আট মাইলের কিছু বেশী) উঁচুতে উঠে রেকর্ড তৈরি করেছিল। ১৯৫২ সালে রকেটের উঁচুতে ওঠার রেকর্ড হয়েছিল ২১৭ কিলোমিটার (১৩৩ মাইলের কিছু বেশী) এবং ১৯৫৪ সালে ২৫৪ কিলোমিটার (প্রায় ১৫৯ মাইল)।

বহু-ধাপের রকেট ব্যবহার করে এর চেয়ে ভালো ফল পাওয়া গেছে এবং তা খুবই স্বাভাবিক। বহু-ধাপের রকেটের রেকর্ড হচ্ছে —১৯৪৯ সালে ৪০০ কিলোমিটার (২৫০ মাইল), ১৯৫৩ সালে ৫০০ কিলোমিটারের কিছু কম (৩০০ মাইলের বেশী), হালে একহাজার কিলোমিটারের চেয়েও বেশী (ছ-শো মাইলের ওপরে)। অবশ্য পৃথিবী থেকে কোনো একটি জ্যোতিষ্কের দূরত্ব যতোখানি তার তুলনায় রকেটের এই উঁচুতে ওঠার হিসাব খুব একটা জাহির করে

বলার মতো ব্যাপার নয়। যেমন, পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব এর চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশী, পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের গ্রহের দূরত্ব এর চেয়ে কয়েক লক্ষ গুণ বেশী। তবুও রকেটবিজ্ঞান যতোখানি সফল হয়েছে তাকে তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়।

হালের রকেট যে-বেগে ছুট দেয় তা যদি দ্বিগুণ বাড়ানো যায় তাহলে সেই রকেটটি হয়ে উঠবে পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। আর কয়েক বছরের মধ্যেই এ-ব্যাপার সম্ভব হতে পারে।* আর এই বেগকে যদি তিনগুণ বাড়ানো যায় তাহলে রকেটটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে চাঁদের দিকে ছুট দেবে।

অবশ্য যতোটা সহজ মনে হচ্ছে সমস্যাটি ততো সহজ নয়। রকেটের বেগ আরো দু-তিন গুণ বাড়াতে হলে রকেটের ভার (weight) কমানো দরকার, ভরের অনুপাত (mass-ratio) বাড়ানো দরকার, আর রকেটটিকে এমন মজবুত ভাবে তৈরি করা দরকার যাতে আরো বেশী তাপ ও চাপ সহ্য করতে পারে। ইঞ্জিনীয়ার ও বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এইসব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।

অনেকেই বিশ্বাস করে যে যন্ত্রবিদ্যায় একটা বিপ্লব না হলে মানুষের পক্ষে মহাকাশে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। এই ধারণা ভুল। নভোচারণা যে অবান্তর ব্যাপার নয়, এটা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। রকেটবিদ্যা, দূর থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা—এসব দিকে যতোই সফলতার সঙ্গে অগ্রগতি হচ্ছে ততোই একথা বিশ্বাস করার কারণ ঘটছে যে মানুষের ইতিহাসে মহাশূন্যে

* এই বই প্রকাশিত হবার অল্প কিছুকালের মধ্যেই ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর দুটি উপগ্রহ তৈরি করেছেন—দুটি খোকাচাঁদ বা যাদের নাম দেওয়া হয়েছে একনম্বর ও দু'নম্বর স্পুটনিক।—বাংলা অনুবাদক

পর্যটন করার যুগ উপস্থিত। নানা দেশের বিজ্ঞানীরা আজকাল এই নিয়ে মেতে আছেন। নভোচারণবিদ্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন শুধু কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নয়, সর্বসাধারণ। আর যুদ্ধের সময় থেকে কুড়িটিরও বেশী দেশে নভোচারণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে তিরিশ বছর আগেই শৌখিন নভোচারণ দল ছিল। আগামী দিনে যারা মহাশূন্যে পাড়ি দেবে তাদের জন্য ১৯৫৪ সালে চ্কালভ কেন্দ্রীয় বিমান ক্লাবের পক্ষ থেকে একটি নভোচারণ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমি হালে মহাশূন্যে পর্যটন সম্পর্কে একটি যুক্ত কমিশন গঠন করেছেন এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণাকে উৎসাহ দেবার জন্য সিওল্‌কোভস্কি পদক দেবেন বলে ঠিক করেছেন। এইসব ব্যবস্থার ফল হিসেবে নিঃসন্দেহে সেই দিনটি আরো এগিয়ে আসবে যেদিন মহাশূন্যে পাড়ি দেবার পথে আর কোনো সমস্যা থাকবে না।

গ্রহ থেকে গ্রহে পর্যটন করার সম্ভাবনাকে আজকের দিনে যতোটুকু বুঝতে পারা যাচ্ছে তা সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করা এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য।

ব্যোমযান

পৃথিবী ছাড়িয়ে ছুট দেবার সমস্যা

১নং চিত্রে সৌরমণ্ডলকে দেখানো হয়েছে। এই সৌরমণ্ডলের সীমাহীন বিস্তৃতিতে আগামী দিনের ব্যোমযান যাতায়াত করবে।

সৌরমণ্ডলের ন'টি বড়ো গ্রহের মধ্যে পৃথিবী একটি। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ১৫,০০,০০,০০০ কিলোমিটার (৯,৩০,০০,০০০ মাইল)। সূর্যের চারদিকে বাতাসহীন মহাশূন্যে প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রচণ্ড



চিত্র নং ১। সৌরমণ্ডলের রেখাচিত্র।



চিত্র নং ২। সূর্য ও গ্রহগুলির আকারগত তুলনা।

গতিতে পৃথিবী ঘুরছে। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকে জ্যোতিষিক একক ধরা হয়। আরো আটটি বড়ো গ্রহ আর অনেকগুলো ছোট গ্রহ—যাদের বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ—মোটামুটি একই সমতলের কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। সূর্য ও বিভিন্ন গ্রহের আকারগত একটা তুলনা ২নং ছবিতে দেখানো হল।

গ্রহজগতের শেষে রয়েছে প্লুটোর কক্ষপথ। এটি হচ্ছে সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বাইরের দিকের গ্রহ। সূর্য থেকে এই গ্রহটির দূরত্ব প্রায় ৬,০০,০০,০০,০০০ কিলোমিটার (৩,৬৭,০০,০০,০০০ মাইল)। ব্যোমযান এই সীমাহীন বিস্তৃতিতে পাড়ি দেবে। আর পাড়ি দেবার সময়ে কখনো সূর্যের আকর্ষণে গা ভাসাবে আর কখনো বা সূর্যের আকর্ষণকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। আর এমনভাবে পাড়ি দেবে যেন ছুটন্ত উল্কা বা গ্রহাণুপুঞ্জের সঙ্গে ধাক্কা না লাগে।

মহাশূন্যে একটি রকেট পাঠাতে হলে কি কি বাধা দূর করতে হবে?

সবচেয়ে বড়ো বাধা হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ। পৃথিবী সমস্ত কিছুকে তার কেন্দ্রের দিকে টানছে। এই টানার ক্ষমতা শুধু যে পৃথিবীরই

আছে তা নয়, সমস্ত বস্তুরই আছে—ছোট্ট বালুকণারও আছে, বিরাট নক্ষত্রেরও আছে। আমাদের চারদিকে যেখানে যতো জিনিস আছে —সবাই সবাইকে টানছে। কিন্তু আমরা এই টানকে টের পাই না, কারণ এই টানের কিছুমাত্র জোর নেই। কিন্তু পৃথিবীর টান বা মাধ্যাকর্ষণকে আমরা সব সময়েই টের পাই।

মাধ্যাকর্ষণের টান যদি না থাকত তাহলে কোনো কিছুই পৃথিবীর গায়ে লেগে থাকত না। সবকিছুই মহাশূন্যে ছিটকে যেত, সূর্যকে ছাড়িয়ে পৃথিবী আর পৃথিবীকে ছাড়িয়ে চন্দ্র দূরে সরে যেত। আবার এই টান আছে বলেই গ্রহে-গ্রহান্তরে পাড়ি দেবার সমস্যাটি জটিল হয়েছে।

একটি রকেট পৃথিবী ছাড়িয়ে এমনভাবে ছুট দিতে পারে কি যাতে আর পৃথিরীতে ফিরে আসতে না হয়?

হ্যাঁ, পারে। মনে করা যাক, একটা উঁচু পর্বতের চুড়ো থেকে মাটির সমান্তরালভাবে (horizontal) রকেট ছোঁড়া হচ্ছে। ধরে নেওয়া যাক, বাতাস এত পাতলা যে রকেটের পাল্লার পক্ষে তা কিছুমাত্র বাধা নয়। এখন এই চুড়ো থেকে যদি একটি রকেট ছোঁড়া হয় তাহলে দেখা যাবে, রকেটটি প্রায়-খাড়া একটি গতিপথ অনুসরণ করে চুড়ো থেকে কিছুটা দূর গিয়ে মাটিতে পড়েছে। এবার রকেটের জ্বালানির যোগান ও বেগ দ্বিগুণ করা যাক। দেখা যাবে, রকেটটি আরো খানিকটা দূরে গিয়ে পড়েছে এবং রকেটের গতিপথ আরেকটু কম-খাড়া হয়েছে। এভাবে রকেটের বেগকে ক্রমেই বাড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে। তাহলে শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থায় পৌছানো সম্ভব যখন রকেটের গতিপথের বাঁক আর পৃথিবীর উপরিতলের বাঁক সমান। এই অবস্থায় পৌছতে পারলেই রকেটটি পৃথিবীর চারিদিকে অনবরত



চিত্র নং ৩। রকেটের বেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রকেটের পাল্লা বাড়বে এবং রকেটের গতিপথ ততোই কম বাঁক নেবে। চক্রবেগে পৌঁছবার পরে (চিত্রে সবচেয়ে ওপরের কক্ষ) রকেটটি হয়ে ওঠে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ এবং পৃথিবীর উপরিতলের সমান্তরাল ভাবে ছুট দেয়।

পাক খেয়ে চলবে। অর্থাৎ, রকেটটিও হয়ে উঠবে চন্দ্রের মতো পৃথিবীর একটি উপগ্রহ এবং রকেটটি কোনো সময়েই মাটিতে পড়বে না।

সবচেয়ে কম যে-বেগে একটি বস্তু মাটিতে পড়ে না গিয়ে পৃথিবীর চারদিকে পাক খায় তার নাম প্রথম নভোচারণ বেগ বা চক্রবেগ।

এই বিশেষ মাপের বেগে ছুট দিতে পারলে কোনো বস্তু কেন মাটিতে পড়ে যায় না?

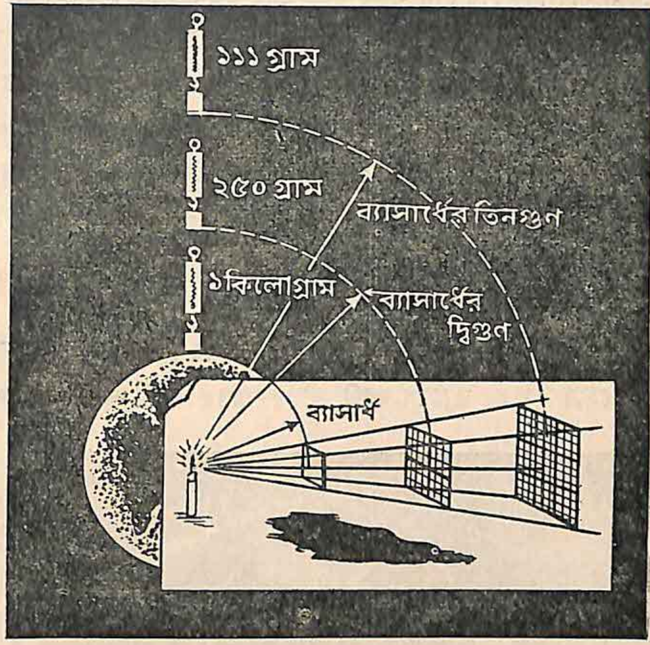
মনে করা যাক একটি উড়োজাহাজ বিষুবরেখা বা মধ্যরেখা বরাবর পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এ-অবস্থায় উড়োজাহাজটির মধ্যে বাইরের দিকে ছিট্‌কে যাবার একটা ক্ষমতা এসে যায়। উড়োজাহাজটির বেগ যতো বাড়ে, এই ক্ষমতাও ততো বাড়ে। আর এই ক্ষমতা যতো বাড়ে ততোই উড়োজাহাজটি বাইরের দিকে ছিট্‌কে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু উল্‌টোদিকে রয়েছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের

টান। উড়োজাহাজটির বেগ যখন কম থাকে তখন এই ছিট্‌কে বেরিয়ে যাবার ক্ষমতাটা বিশেষ টের পাওয়া যায় না। কিন্তু উড়োজাহাজের বেগ যদি সেকেণ্ডে ৭·৯ কিলোমিটার (প্রায় ৫ মাইল) মাপে পৌছতে পারে তাহলে এই ছিট্‌কে বেরিয়ে যাবার ক্ষমতা আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান সমান সমান হয়ে যায়। এই বিশেষ মাপের বেগকেই আমরা বলি চক্রবেগ। কোনো উড়োজাহাজ যদি এই চক্রবেগে ছুট দিতে পারে আর বাতাসের বাধা যদি না থাকে তাহলে উড়োজাহাজটি নিজস্ব গতিবেগেই অনন্তকাল ধরে পৃথিবীর চারদিকে পাক খেয়ে চলবে। অর্থাৎ, উড়োজাহাজটি হয়ে উঠবে পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ।

আর যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানকে ছিঁড়ে কোনো বস্তুকে মহাশূন্যে ছুট দিতে হয় তাহলে সেই বস্তুটির বেগ কতখানি হওয়া দরকার?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান আছে, নভোলোকের প্রত্যেকটি বস্তুরই আছে। এই টানের কেন্দ্র থেকে যতোই দূরে যাওয়া যায় ততোই এই টান কমে। কতখানি কমে তার মাপটা হচ্ছে এই—আলোর উৎস থেকে একটি বস্তুকে যতোই দূরে সরিয়ে নেওয়া যায় ততোই বস্তুটির উজ্জ্বলতা কমে; যে-হারে কমে, মাধ্যাকর্ষণের টানও কমে সেই একই হারে। অঙ্কের হিসেবে, দূরত্বের বর্গমূলের বিপরীত অনুপাতে। তার মানে, বস্তুকে যদি দ্বিগুণ দূরে সরিয়ে নেওয়া যায় তাহলে মাধ্যাকর্ষণের টান কমে যাবে চারগুণ, তিনগুণ দূরে সরিয়ে নিলে টান কমবে নয় গুণ।

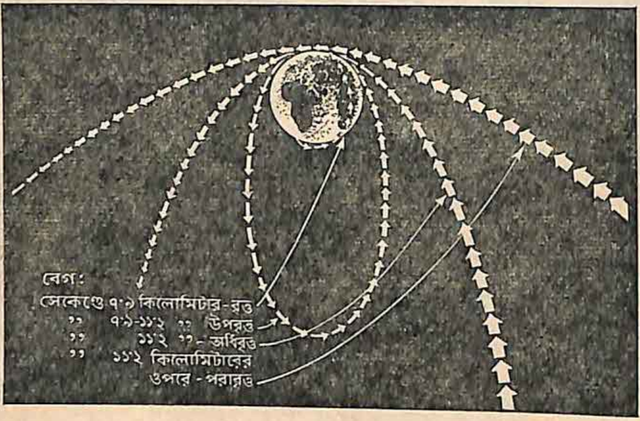


চিত্র নং ৪। আলোর উৎস থেকে একটি বস্তুকে যতোই দূরে সরিয়ে নেওয়া যায় ততোই বস্তুটির উজ্জ্বলতা কমে; যে-হারে কমে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানও কমে সেই একই হারে।

যদি কোনো বস্তুকে কোনো গ্রহের টান ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে হয় তাহলে যে-পরিমাণ শক্তিক্ষয় হবে তা হচ্ছে সেই একই বস্তুকে সেই গ্রহের কেন্দ্র থেকে উপরিতলে ঠেলে তোলার শক্তিক্ষয়ের সমান। অবশ্য ধরে নেওয়া হয়েছে যে বস্তুটিকে গ্রহের কেন্দ্র থেকে উপরিতলে ঠেলে তোলবার সময় বস্তুটি কেন্দ্র থেকে যতোই দূরে সরে আসুক

না কেন, মাধ্যাকর্ষণের টান একই রকম থেকেছে। মাটির কাছাকাছি জায়গায় বস্তুটির মধ্যে একটা বেগ তৈরি করতে পারলেই মাধ্যাকর্ষণের টান ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার ব্যাপারটিকে ঘটানো যেতে পারে। দেখা যাবে এই বেগপ্রাপ্ত বস্তুটি একটি অধিবৃত্তাকার (parabola) পথে ছুটছে (৫নং চিত্র)। এ থেকেই অধিবৃত্ত-বেগ শব্দটা এসেছে। এই অধিবৃত্ত-বেগের অপর নাম দ্বিতীয় নভোচারণ বেগ বা 'নিষ্ক্রমণ বেগ'। পৃথিবীর উপরিতলে নিষ্ক্রমণ-বেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ১১'২ কিলোমিটার (প্রায় ৭ মাইল)।

বেগপ্রাপ্ত বস্তুটির ছুট যদি চক্রবেগের চেয়ে বেশী এবং অধিবৃত্ত-বেগের চেয়ে কম হয় তাহলে বস্তুটি উপবৃত্তাকার (ellipse) কক্ষপথ



চিত্র নং ৫। ব্যোমযানের গতিপথ।

অনুসরণ করবে। আর যদি বস্তুটির ছুট অধিবৃত্ত-বেগের চেয়ে বেশী হয় তাহলে বস্তুটির গতিপথ হবে একটি পরাবৃত্ত (hyperbola)।

হিসেবের সুবিধের জন্য আমি ধরে নিয়েছি যে বস্তুটির ওপরে শুধু পৃথিবীরই টান আছে। আসলে কিন্তু সূর্যও বস্তুটিকে টানছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে কোনো বস্তুকে যদি পৃথিবী ও সূর্যের টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে হয় তাহলে বস্তুটির ছোটার বেগ অন্তত সেকেণ্ডে ১৬'৭ কিলোমিটার (১০ মাইলের কিছু বেশী) হওয়া দরকার। এই বেগের নাম তৃতীয় নভোচারণ বেগ।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নভোচারণ বেগ তৈরি করার কাজে নভোচারণ-বিজ্ঞানকে অতি অবশ্যই সফল হতে হবে।

ব্যোমযানের গোড়ার কথা—রকেট

ভবিষ্যতের ব্যোমযান রকেটচালিত হবে, এটা মোটামুটি সবাই মেনে নিয়েছেন। রকেট থেকে তোড়ে গ্যাস বেরিয়ে আসবে আর তারই ধাক্কায় রকেট মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলবে। রকেট-ভ্রমণে কোনোরকম বিপদ নেই কারণ, কামানের গোলার সঙ্গে রকেটের তফাৎ এই যে রকেট আস্তে আস্তে গতিবেগ সঞ্চয় করে। এজন্যই যাত্রা-শুরুর সময়ে শরীরের ওপরে অপেক্ষাকৃত কম চাপ পড়ে এবং মহাকাশ-যাত্রীর কোনো ক্ষতি হয় না।

বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে যাবার সময়ে রকেটচালিত ব্যোমযানের বেগ অপেক্ষাকৃত কম হবে বলে ব্যোমযানটি খুব বেশী বাতাসের বাধা পাবে না, আর বাতাসের সঙ্গে ঘষা লেগে যে তাপ হবে তাও হবে খুবই সামান্য।

রকেট-মোটরের সাহায্যে মহাকাশ-যাত্রী ব্যোমযানের বেগ বাড়াতে বা কমাতে পারবে, অথবা দরকারমতো ব্যোমযানকে যেদিকে খুশি ঘুরিয়ে নিতে পারবে।

রকেটের ছুট তৈরি হয় কিভাবে? মূলনীতিটা কি?

একজন রাইফেলধারী যখন বন্দুক থেকে গুলী ছোঁড়ে তখন বন্দুক পেছন দিকে ধাক্কা মারে। বন্দুকের নলের ভেতরে বারুদ পুড়ে যে গ্যাস তৈরী হয়েছিল সেই গ্যাসের চাপেই এই ধাক্কা। এই গ্যাস একদিকে চাপ দেয় বুলেটের ওপরে, অন্যদিকে রাইফেলের ওপরে। দুটো চাপই সমান। কিন্তু বুলেটের চেয়ে রাইফেলের ওজন অনেক বেশী বলে রাইফেলের ওপরে ফিরতি ধাক্কাটা আস্তে হয়। এটা হচ্ছে বলবিদ্যার একটি প্রধান সূত্র। সূত্রটি এই: প্রত্যেক ক্রিয়ায় সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে। প্রতিক্রিয়া-জনিত গতিকে বলা হয় প্রতিক্রিয়া গতি।

উৎসবের সময়ে বারুদ পুড়িয়ে যে ধরনের রকেট ছোঁড়া হয় ঠিক সেই ধরনের রকেটকে ব্যোমযানের মোটর হিসেবে ব্যবহার করা চলে না, কারণ বারুদ পুড়ে যে চাপ তৈরী হয় তা খুবই বেশী। এত বেশী চাপ সহ্য করতে হলে রকেটটি খুব মজবুতভাবে তৈরী হওয়া দরকার এবং তা করতে গেলে রকেটটি ভারী হয়ে যাবে। তা ছাড়াও কথা আছে। রকেট ছোটবার সময়ে বারুদ আস্তে পুড়বে না তাড়াতাড়ি পুড়বে তার ওপরে কোনো হাত থাকে না, যেমন হাত নেই মোমবাতি জ্বলার সময়ে মোমবাতির শিখাটা বেশী হবে না কম হবে তার ওপরে। বারুদ পুড়তে শুরু করলে থামানো যায় না, কাজেই দরকার মতো ব্যোমযানের মোটর বন্ধ করার জন্য বারুদের পুড়ুনি বন্ধ করার উপায় নেই।

আজকাল রকেটে ব্যাপকভাবে তরল জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। রকেটের মোটর খুশিমতো থামাবার ব্যাপারে বারুদ-রকেটের চেয়ে তরল জ্বালানির রকেট অনেক বেশী কাজের।

৬নং চিত্রে একটি তরল জ্বালানির রকেট দেখানো হয়েছে। রকেটটিতে দুটি ট্যাঙ্ক; একটিতে আছে সেই জিনিস যা রকেটকে চালিত করবে (যেমন, ইথাইল অ্যাল্‌কোহল), অপরটিতে আছে সেই জিনিস যা অক্‌সিজেনের যোগান দিয়ে অন্য ট্যাঙ্কের জিনিসটিকে পুড়তে সাহায্য করবে (যেমন, তরল অক্‌সিজেন)।



চিত্র নং ৬। তরল জ্বালানির রকেট।

টারবাইন চালিত দুটি পাম্পের সাহায্যে এই দুটি ট্যাঙ্ক থেকে তরল বস্তু নিয়ে যাওয়া যায় একটি বিশেষ কামরায়, আর সেখানে একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে (অর্থাৎ, তরল জ্বালানি পুড়তে শুরু করে)। এর ফলে যে গ্যাস তৈরী হয় তা দহন-কামরা

থেকে বেরিয়ে আসে, আর যেদিক দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে আসে তার উল্টো দিকে তৈরী হয় একটা ধাক্কা। এই ধাক্কার ঠেলায় রকেট সামনের দিকে ছুট দেয়।

তবে রকেট বারুদেরই হোক বা তরল জ্বালানিরই হোক, ছুট দেবার সময়ে রকেটটি যাতে সিধে থাকে তা নির্ভর করে বাতাস কেটে চলার পাখনার ওপরে আর হালের ওপরে।

কিন্তু রকেট যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে মহাশূন্যের রাজ্যে পৌছয় তখন আর এসব পাখনা বা হাল কোনো কাজেই লাগে না। সেই মহাশূন্যের রাজ্যে রকেট যদি নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে বেচাল হয়ে যায় তবে মহাকাশ-যাত্রী কি করবে? এই সমস্যার সমাধান করেছেন কে. ই. সিওল্‌কোভস্কি। তাঁর মতে, রকেটের নল থেকে তোড়ে বেরিয়ে-আসা গ্যাসের মাঝখানে যদি একটি হাল লাগানো যায় তাহলে মহাশূন্যে ছুট দেবার সময়েও রকেটের গতিমুখ ফেরানো যেতে পারে।

রকেটের ছুট দেবার বেগ কোন্ কোন্ জিনিসের ওপর নির্ভর করে?

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির এলাকার বাইরে মহাশূন্যে রকেটের বেগ কতখানি হবে তা নির্ভর করে দুটো জিনিসের ওপরে—কতখানি বেগে রকেটের নল থেকে গ্যাস বেরিয়ে আসছে আর কতখানি জ্বালানি খরচ হয়েছে। এজন্যই বিশেষ করে সেইসব জ্বালানি রকেটে ব্যবহার করা হয় যার নিষ্ক্রমণ-বেগ সবচেয়ে বেশী। যেমন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন। তবে হাইড্রোজন এত হাল্‌কা যে হাইড্রোজেনকে জমিয়ে তরল করে নেবার পরেও অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে। কাজেই অন্য কোনো জ্বালানি রাখার জন্য যতো বড়ো ট্যাঙ্ক দরকার হয়, হাইড্রোজেন রাখার জন্য দরকার হয় তার চেয়েও বড়ো ট্যাঙ্ক।

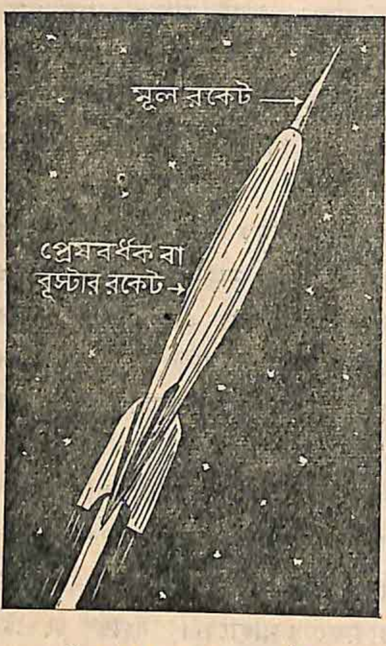
তার ওপরে তরল হাইড্রোজেন—২৫৩° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে ফুটতে শুরু করে। এর চেয়ে নাইট্রিক অ্যাসিড ও হাইড্রাজিন (নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক মিলন,) জ্বালানি হিসেবে অনেক বেশী সুবিধের। এই দুটি তরল পদার্থকে অনেক সহজে নাড়াচাড়া করা যায় এবং ছোট ট্যাঙ্কে ভরে রাখা চলে। রকেট চালাবার জন্য আরো কয়েকটি তরল পদার্থকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, কেরোসিন, বেন্‌জিন, তার্পিন, প্যারাফিন, ইত্যাদি। এদের সঙ্গে অক্‌সিজেনের জোগানদার হিসেবে থাকবে পার্‌ক্লোরিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন পারোক্‌সাইড, ইত্যাদি।

রকেট চালাবার এ-সমস্ত তাপ-রাসায়নিক জ্বালানির নিষ্ক্রমণ-বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ২·৫ কিলোমিটার (দেড় মাইল)। কিন্তু একথা মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে এই নিষ্ক্রমণ বেগকে সেকেণ্ডে চার কিলোমিটার (প্রায় আড়াই মাইল) পর্যন্ত বাড়ানো যায়। এর ফলে ব্যোমযান তৈরি করার সমস্যাটি সহজ হয়ে যাবে।

রকেটের বেগ ও পাল্লা বাড়িয়ে তোলার অন্য একটি উপায় আছে। তা হচ্ছে সহায়ক রকেটের সাহায্য নেওয়া। এই সহায়ক রকেটের সমস্ত জ্বালানি শেষ হয়ে যাবার পরে এটি আপনা থেকেই খসে পড়ে এবং মাটিতে এসে পৌছয় প্যারাস্যুটের সাহায্যে। সহায়ক রকেটের সাহায্যে আসল রকেটটি কিছুটা উঁচুতে উঠে আসে এবং কিছুটা বেগ সঞ্চয় করে, এইটুকুই সহায়ক রকেটের কাজ এবং এই কাজ হয়ে যাবার পর সহায়ক রকেটটি খসে পড়লে তবেই আসল রকেটটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই কারণেই সাধারণ রকেটের চেয়ে এ-ধরনের রকেটের পাল্লা অনেক বেশী হতে পারে। এই বিশেষ ধরনের রকেটের নাম পর্যায়-

রকেট বা ধাপ-রকেট। ধাপের (প্রেষবর্ধক বা বুস্টার) সংখ্যা বাড়িয়ে রকেটের বেগ ও পাল্লা বাড়ানো যেতে পারে।

গত কয়েক বছরে যে সমস্ত পরীক্ষা করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে প্রেষবর্ধক বা বূস্টার হিসেবে বারুদ-রকেটের ব্যবহার খুবই সুবিধের, কারণ বারুদ-রকেটে যে ধাক্কা তৈরী হয় তা ওজনের তুলনায় খুবই বেশী। এমনও হতে পারে যে ব্যোমযানকে গোড়ার ধাক্কাটা দেবার জন্য এই বারুদ-রকেট ব্যবহার করা হবে।



চিত্র নং ৭। দু-ধাপের রকেট।

নিষ্ক্রমণ-বেগকে আরো বাড়াতে হলে রকেটকে চালাবার জন্য প্রচলিত রসদ ব্যবহার না করে ব্যবহার করতে হবে পরমাণবিক রসদ।

পরমাণবিক রসদ কি? প্রচলিত রসদের চেয়ে পরমাণবিক রসদের উৎকর্ষ কিসে?

আধুনিক পদার্থবিদ্যায় কোনো কোনো রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তর সম্ভব হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই রূপান্তর-প্রক্রিয়া চলার সময়ে পরমাণবিক তেজ নিঃসৃত

হয়। যে পদার্থ থেকে এ-ধরনের তেজ পাওয়া যেতে পারে তাকেই বলা হয় পরমাণবিক রসদ। সামান্য পরিমাণ পরমাণবিক রসদ থেকে বিপুল পরিমাণ তেজ পাওয়া যেতে পারে।

পরমাণু-তেজ নিঃসৃত হবার প্রক্রিয়াটি এক লহমার মধ্যে ঘটে যায়। তবে এ ব্যাপারটাকে যে একেবারেই আয়ত্তের মধ্যে আনা যায় না তা নয়।

কোনো কোনো তরল পদার্থকে (যেমন তরল হাইড্রোজেন বা হিলিয়াম) গ্যাসে পরিণত করার জন্য পরমাণবিক তেজ ব্যবহার করা যেতে পারে। তারপর সেই গ্যাসকে রকেট থেকে ঠেলে বার করা হবে।

পরমাণবিক রসদ আর কোনো তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ—এই দু'য়ে মিলে যা হয় তাকে বলা হয় 'পরমাণবিক জ্বালানি'।

মনে রাখতে হবে যে পরমাণবিক রসদ বা পরমাণবিক জ্বালানি—এই কথাগুলো নিতান্তই প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ ব্যাপারটা যা ঘটছে তা হচ্ছে এই যে নিঃসৃত পরমাণবিক তেজকে চালান দেওয়া হচ্ছে একটি অনড় পদার্থের মধ্যে। দহনক্রিয়া বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে এ-ব্যাপারের কোনো সাদৃশ্য নেই।

পরমাণবিক রকেটের নল থেকে গ্যাস বেরিয়ে আসবে সেকেণ্ডে কয়েক ওজন কিলোমিটার বেগে। আর নিষ্ক্রমণ বেগ যতো বেশী হবে ততোই গ্রহ থেকে গ্রহে পর্যটনের জন্য কম জ্বালানির প্রয়োজন হবে। এইটেই হচ্ছে পরমাণু-রকেটের মস্ত একটা সুবিধে।

পরমাণবিক রকেটকে চালানো হয় এইভাবে। তরল জ্বালানির রকেটের দহন কামরার মতো একটা ছোট কামরায় তরল হাইড্রোজেন বা অন্য কোনো তরল পদার্থের যোগান থাকে। পলকের জন্য নিঃসৃত

পরমাণবিক তেজ হাইড্রোজেনকে প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত করে তোলে। ফলে হাইড্রোজেন তরল অবস্থা থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং প্রচণ্ড চাপে কামরা থেকে তোড়ে বেরিয়ে আসে।

যদিও মূলনীতির দিক থেকে সাধারণ রকেট ও পরমাণবিক রকেটের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই তবু কতকগুলো যান্ত্রিক অসুবিধের জন্য পরমাণু-রকেট তৈরি করা যাচ্ছে না। প্রথমত পরমাণু-রকেটে যে অস্বাভাবিকরকমের উচ্চ উত্তাপ ও চাপ তৈরী হয় তা কমানো দরকার। এমন কোনো ধাতু নেই যা এই উত্তাপ ও চাপ সহ্য করতে পারে। দ্বিতীয়ত, পরমাণবিক তেজ নিঃসৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটে এবং পরমাণবিক রকেটে এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে মহাকাশ-যাত্রীকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে বাঁচানো যায়। সাফল্যের সঙ্গে এই সমস্যার সমাধান করতে হলে এমন একটা কিছু পদার্থ উদ্ভাবন করতে হবে যা এই বিকিরণকে আড়াল করতে পারবে। তা ছাড়াও এই পদার্থটি হালকা হওয়া দরকার, কারণ পদার্থটির ওজন বেশী হয়ে গেলে রকেটের পাল্লা যথেষ্ট পরিমাণে কমে যাবে।

ব্যোমযানের গড়ন

ব্যোমযানের গড়ন কি হবে তা অনেকখানি নির্ভর করবে তার উদ্দেশ্যের ওপরে। চন্দ্রে নামবার জন্য যে রকেট তৈরি করা হবে তার গড়ন আর চাঁদে না নেমে তার চারদিকে পাক খাবার জন্য যে রকেট গড়া হবে তার গড়ন—এ-দু'য়ের মধ্যে নানা দিকে নানা অমিল থাকবে। মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেবার রকেটের গড়ন শুক্রগ্রহে পাড়ি

দেবার রকেটের মতো হবে না। তাপ-রাসায়নিক জ্বালানির রকেট আর পরমাণবিক ব্যোমযানের মধ্যে পার্থক্য হবে অনেকখানি।

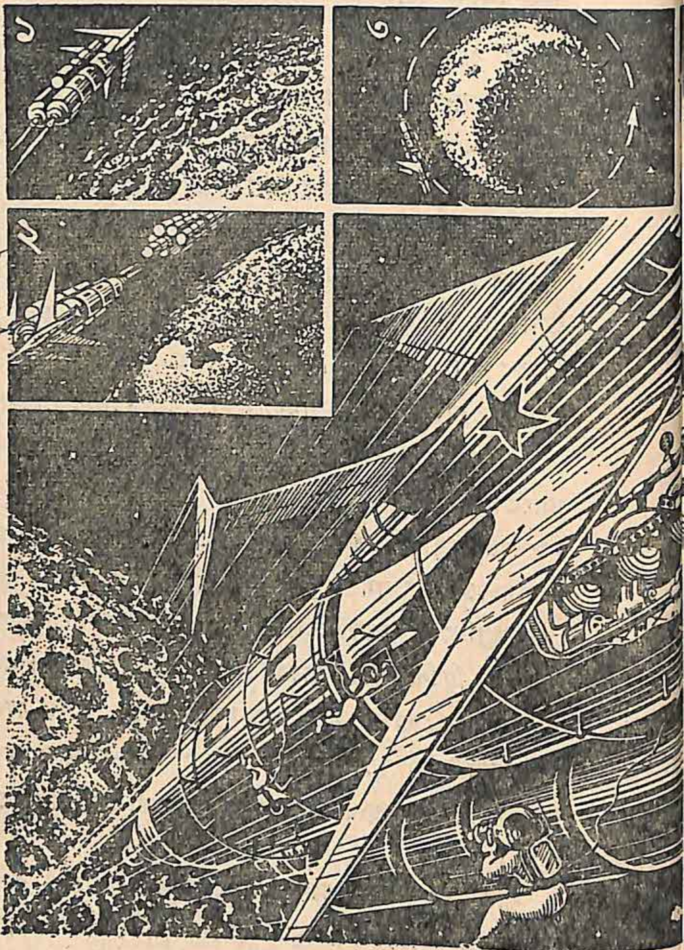
ব্যোমযানের যাত্রীদের সঙ্গে বাইরের কোনোরকম যোগাযোগ থাকবে না। এদিক থেকে ব্যোমযানের সঙ্গে ডুবোজাহাজের অনেকটা মিল আছে। রকেটের ভেতরকার বাতাসের উপাদান, চাপ, উত্তাপ ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত হবে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু নিজস্ব ক্ষেত্রে ব্যোমযানের একটি মস্ত সুবিধে আছে। বাইরের চাপ ও ভেতরের চাপের মধ্যে তফাৎ ব্যোমযানের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম। আর এই তফাৎ যতোই কমবে, ব্যোমযানের খোলস ততোই পাতলা হবে।

ব্যোমযানের তাপ ও আলোর জন্য সূর্যের কিরণকে ব্যবহার করা চলবে। সূর্যের আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিকে ঠেকাতে না পারলে মানুষের শরীরের ক্ষতি হতে পারে, সুতরাং তাকে ঠেকাবার জন্য ব্যোমযানের খোলস আড়াল হিসেবে কাজ করবে।

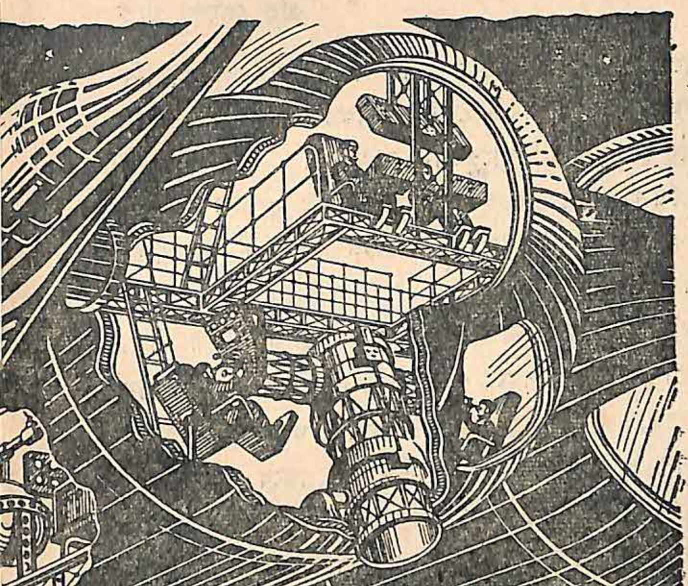
উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে ব্যোমযানের ঠোকাঠুকি হতে পারে—সেজন্য নিরাপত্তা হিসেবে ব্যোমযানের খোলস হবে জোড়া-পর্দার খোলস।

পৃথিবীর কোনো কৃত্রিম উপগ্রহের দিকে পাড়ি দেবার জন্য যে ব্যোমযান গড়া হবে তা যদি তাপ-রাসায়নিক জ্বালানির হয় তবে তা হবে অনেকটা বহু-ধাপের রকেটের মতো এবং বিমানপোতের মতো বড়ো।

যাত্রা শুরু করার আগে ব্যোমযানটির ওজন হবে কয়েক-শো টন। আর মোট ওজনের মোটামুটি একশো ভাগের এক ভাগ অংশ শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে। রকেটের বিভিন্ন ধাপগুলো এমন হবে যেন একটার সঙ্গে আরেকটার যতোটা সম্ভব নিবিড় যোগ থাকে। আর বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে পাড়ি দেবার সময়ে বাতাসের বাধা কমাবার জন্য গোটা রকেটটিকে স্ট্রীম্‌লাইন-করা খোলের মধ্যে পুরে রাখা



চিত্র নং ৮। মাঝখানে : চন্দ্রের চারদিকে পাক খেয়ে আসার জন্য তৈরী ব্যোমযান
কৃত্রিম উপগ্রহ হতে চলেছে। ৩। চন্দ্র পরিক্রমা। ৪। চন্দ্র থেকে পৃথিবীর দি
বেরিয়ে এসেছে। ৬। গ্লাই



। ১। পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে যাত্রা-শুরু। ২। ব্যোমযানটি চন্দ্রের
ক যাত্রা। ৫। পৃথিবীর কাছাকাছি আসার পরে ব্যোমযান থেকে গ্লাইডার
ার মাটিতে নামছে।

হবে। যাত্রীদের জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট একটা কেবিন আর বাকি মালপত্র রাখার জন্য আরেকটি কেবিন—সম্ভবত এই দু'টি কেবিন তৈরি করা হবে রকেটের একেবারে সামনের দিকে।

এই রকেটের যাত্রীদের খুব অল্প সময়ের জন্যই রকেটে থাকতে হবে (এক ঘণ্টারও কম); কাজেই জটিল কোনো যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হবে না।

নির্দিষ্ট সময়ে একটি স্বয়ংক্রিয় স্টার্টারের সাহায্যে রকেটটির যাত্রা শুরু হবে। পাড়ি দেবার সময়ে রকেটটিকে ঠিক পথে চালনা করার জন্য এবং মাপজোখ নেবার জন্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি থাকবে। রকেটের এক একটি ধাপ ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়বে এবং মাটিতে নেমে আসবে হয় প্যারাসুটের সাহায্যে কিংবা খোলা বা মোড়া চলে এমন ডানার সাহায্যে সেগুলোকে গ্লাইডারে রূপান্তরিত করে।

ব্যোমযানের আরেক ধরনের গড়নের একটা ছবি ৪০-৪১ পৃষ্ঠায় দেওয়া হল। এই ধরণের ব্যোমযান পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে চাঁদের দিকে যাত্রা শুরু করবে এবং চাঁদে না নেমে চাঁদের উপরিতলকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে। যাত্রা শেষ হবার পরে ব্যোমযানটি সরাসরি ফিরে আসবে পৃথিবীতে। ছবির দিকে তাকালে বোঝা যাবে, এই রকেটের প্রধান অংশ হচ্ছে দুটি জোড়ে বসানো (coupled) রকেট, তিন জোড়া সিলিণ্ডার আকারের ট্যাঙ্ক যার মধ্যে থাকবে রকেট চালাবার রসদ আর অক্সিজেনের যোগান, আর পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসার জন্য দুটি ব্যোমচারী গ্লাইডার যাদের ডানা খোলা-মোড়া চলে। এই ব্যোমযানের খোলস স্ট্রীমলাইন-করা না হলেও চলবে, কারণ এই ব্যোমযানটির যাত্রা শুরু হবে বায়ুস্তরের বাইরে থেকে।

এই ব্যোমযানটিকে তৈরি ও পরখ করা হবে পৃথিবীতেই, তারপর ব্যোমযানটির অংশ আলাদা আলাদা খুলে নিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে গ্রহান্তর যাত্রার পথে অন্তবর্তী একটি স্টেশনে। এই স্টেশনটিতে আলাদা আলাদা ভাবে পাঠানো হবে জ্বালানি, যন্ত্রপাতি, খাদ্য ও অক্সিজেন।

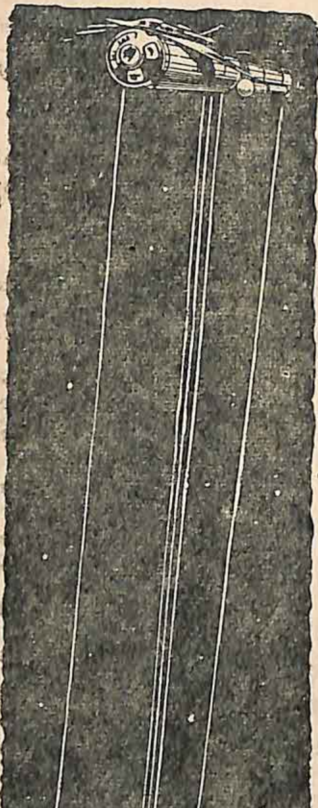
গ্রহান্তরে যাত্রার স্টেশনে ব্যোমযানটির আলাদা আলাদা অংশগুলো জোড়া লাগানো হবে আর তা হয়ে গেলেই ব্যোমযানটি পাড়ি দেবে মহাশূন্যে।

ব্যোমযানের মাঝখানের সিলিণ্ডার-আকারের ট্যাঙ্কগুলো থেকে রকেটের মোটরে রসদ ও অক্সিজেনের যোগান যাবে। এই ট্যাঙ্ক-গুলোই হচ্ছে ব্যোমযানের প্রধান প্রধান কামরা; কামরাগুলোকে সাময়িকভাবে ব্যবহার করা হবে জ্বালানি রাখার জন্য। এই প্রধান কামরাগুলো খালি না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ রকেটের যাত্রা শুরু হবার পরে কয়েক মিনিট পর্যন্ত, ব্যোমযানের যাত্রীদের থাকতে হবে গ্লাইডারের কেবিনে এবং এটুকু অসুবিধে ভোগ করতেই হবে তাদের।

একটি ছোট ভাল্‌ভ-এর ভেতর দিয়ে কামরাগুলোর সঙ্গে বাইরের মহাশূন্যের যোগ থাকবে। এই ভাল্‌ভটি খুলে দিলেই কামরাগুলোর মধ্যে বাকি যেটুকু জ্বালানি থাকবে তা উড়ে যাবে। তারপর কামরা-গুলোর মধ্যে পাম্প করে বাতাস ঢোকানো হবে। যাত্রার শেষ পর্যন্ত মহাকাশ-যাত্রীরা এই কামরাগুলোর মধ্যেই কাটাবে।

চন্দ্র থেকে কিছুটা দূরে থাকতেই ব্যোমযানটি হয়ে উঠবে চন্দ্রের একটি উপগ্রহ। ব্যোমযানের পেছনদিকে ধারের ট্যাঙ্কগুলোতে যে রসদ ও অক্সিজেন থাকবে তা ব্যবহার করা হবে ব্যোমযানটিকে

চন্দ্রের একটি উপগ্রহ করার জন্য, জ্বালানি ফুরিয়ে গেলেই ট্যাঙ্কগুলো খসে পড়বে।



চিত্র নং ৯। ব্যোমযানে কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ তৈরি করা হয়েছে।

আবার যখন ফেরার সময় আসবে তখন ব্যোমযানের মোটর চালানো হবে। এবার জ্বালানি আসবে ব্যোমযানের সামনের দিকের ধারের ট্যাঙ্কগুলো থেকে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকার আগে যাত্রীরা আবার ফিরে যাবে ব্যোমচারী গ্লাইডারের মধ্যে, গ্লাইডারটিকে তারপর পৃথিবীর চারদিকে পাক-খেয়ে-চলা মূল ব্যোমযান থেকে পৃথক করে নেওয়া হবে।

নিরাপদে মাটিতে নেমে আসার জন্য মহাকাশ-যাত্রীরা গ্লাইডারের খোলা-মোড়া ডানার সাহায্য নেবে।

মহাশূন্যে ছুট দেবার সময়ে ব্যোমযানের মোটর যে-মুহূর্তে বন্ধ করে দেওয়া হবে সেই মুহূর্ত থেকে ব্যোমযানের আর কোনো ওজন থাকবে না। তা

হবে মস্ত একটা অসুবিধের ব্যাপার। এই অসুবিধে দূর করার জন্য ব্যোমযানের মধ্যে কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ টান তৈরি করতে হবে।

৮নং চিত্রে যে ব্যোমযানটি দেখানো হয়েছে তাতে এই ব্যবস্থা আছে। ব্যোমযানটির দুটি অংশ ; একই সঙ্গে পাঠানো হয়েছে কিন্তু একটির থেকে আরেকটি পৃথক হয়ে যাবে, যদিও কেবল্-এর সাহায্যে একটির সঙ্গে অপরটি আটকানো থাকবে। ব্যোমযানের দুটি অংশের সাধারণ ভারকেন্দ্র হবে কেবল্-এর মাঝামাঝি একটি বিন্দুতে ; অল্প-ক্ষমতার একটি মোটরের সাহায্যে ব্যোমযানের অংশদুটিকে এই বিন্দুটির চারপাশে পাক খাওয়ানো হবে (৯নং চিত্র)। পাক খাওয়ার বেগ যখন নির্দিষ্ট মাপে এসে পৌঁছবে তখন মোটরটাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং নিজস্ব গতিবেগেই ব্যোমযানের অংশদুটি ঘুরে চলবে। এই ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেছেন সিওল্কোভস্কি। ব্যোমযানের অংশদুটি যখন পাক খায়, তখন প্রত্যেকটি অংশে ছিটকে বেরিয়ে যাবার একটা ক্ষমতা আসে। অথচ তা সম্ভব নয়। এই বাধাপ্রাপ্ত ক্ষমতাকে মাধ্যাকর্ষণের টান বলে মনে হবে।

ব্যোমযান প্রসঙ্গে

যাত্রা-শুরু

মোটরগাড়ি বা ট্রেন বা পাল-তোলা জলযান চলে যতোক্ষণ মোটর-গাড়ি বা ট্রেনের ইঞ্জিন চালু থাকে বা পালে হাওয়া লাগে। কিন্তু ইঞ্জিন বন্ধ হলেই বা পাল গুটিয়ে নিলেই চলা বন্ধ হয়ে যায়।

একথা সত্যি যে তারপরেও মোটরগাড়ি বা ট্রেন বা জলযান সঙ্গে সঙ্গে একেবারে থেমে যায় না; নিজস্ব গতিবেগে আরো কিছুক্ষণ ধরে চলে। তবুও খুব বেশীদূর এভাবে যেতে পারে না; যতোটুকু গতিবেগ সঞ্চিত হয়েছিল তা ঘষা লেগে লেগে আর বাতাসের বাধা পেয়ে পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়।

কিন্তু ব্যোমযানের বেলায় একেবারে অন্য ব্যাপার ঘটে। যাত্রা শুরু করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যোমযানের মোটর প্রচণ্ড বেগ তৈরি করে এবং বাকি পথটুকু ব্যোমযানটি নিজস্ব গতিবেগেই পার হতে পারে। এই গতিবেগ বজায় থাকে, কারণ মহাশূন্যে ব্যোমযানটির সঙ্গে ঘষা লাগার কিছু নেই বা বাতাসের বাধাও নেই।

ব্যোমযানটির যতোখানি বেগে ছুট দেওয়া দরকার তা যতো তাড়াতাড়ি হবে ততো কম সময়ের মধ্যে ব্যোমযানটি মাধ্যাকর্ষণের টান ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে এবং ততো কম জ্বালানি পুড়বে।

সুতরাং, প্রয়োজনীয় বেগ যদি পলকের মধ্যে তৈরী হয়ে যায় এবং বাকি পথটুকু ব্যোমযানটি যদি নিজস্ব গতিবেগে পার হয়ে যেতে পারে তাহলে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি বেঁচে যাবে। কিন্তু বাস্তবে এমনি

একটি কাণ্ড ঘটানো একেবারেই অসম্ভব, কারণ রকেটটির বেগ সঞ্চয় করতে কিছুটা সময় লাগবেই। তাছাড়া, গোড়ার দিকে রকেট যে বেগে ছুট দেবে তা যেন এত বেশী না হয় যে মানুষের শরীর সহ্য করতে পারবে না।

প্রায়ই দেখা যায় যে গ্রহ থেকে গ্রহে পর্যটন সম্পর্কে লেখা কোনো কোনো বইয়ের প্রচ্ছদপটে যে ছবি আঁকা থাকে তাতে একটি ব্যোমযান পৃথিবী থেকে চন্দ্র বরাবর সিধে লাইনে ছুটছে। ছবিতে দেখা যায়, ব্যোমযানটি প্রায় অর্ধেক পথ পার হয়ে এসেছে বা চন্দ্রের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে কিন্তু ব্যোমযানের মোটরটি চালু আছে। এ-ধরনের ছবি একেবারেই ভুল। প্রথমত ব্যোমযানটি যে গতিপথ অনুসরণ করবে তা কক্ষনো সিধে হতে পারে না। দ্বিতীয়ত যাত্রা-শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যে পৃথিবী থেকে কিছুটা দূরে আসার পরেই ব্যোমযানের মোটর বন্ধ করে দিতে হবে। একমাত্র এই উপায়েই ব্যোমযানের ফিরতি পথের জন্য যথেষ্ট জ্বালানি বাঁচানো সম্ভব।

সঠিক গতিপথটি বেছে নেওয়া হয়েছে কিনা—এরই ওপরে মহাশূন্যে যাত্রার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। যে-সব গতিপথে পাড়ি দিলে সবচেয়ে কম জ্বালানি খরচ হবে সেগুলো অত্যন্ত জটিল। সেজন্য রকেটকে অনবরত দিক-পরিবর্তন করতে হবে। যদি সবচেয়ে সহজ গতিপথটি বেছে নেওয়া হয় (যেমন, সিধে খাড়া গতিপথ), তাহলে জ্বালানির খরচ হবে কয়েকগুণ বেশী।

মহাশূন্যে যাত্রার সমস্ত তোড়জোড়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা-শুরুর ক্ষণটি ঠিক করা; কারণ যে জ্যোতিষ্কের দিকেই ব্যোমযানের যাত্রা শুরু হোক না কেন, মহাশূন্যে সেই জ্যোতিষ্কটিও সচল এবং পৃথিবীও সচল।

পাড়ি

ব্যোমযানের মোটরটি যেই বন্ধ হবে, তারপর থেকে দুই গ্রহের মাঝখানকার বাকি দূরত্বটুকু (পুরো দূরত্বের শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশী) ব্যোমযানটি নিজস্ব গতিবেগে গা ভাসিয়ে পার হবে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা চলে, পৃথিবীর কাছাকাছি যে-সব জ্যোতিষ্ক আছে তাদের যে-কোনো একটিতে পাড়ি দিতে হলে--যেখানে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কয়েক লক্ষ কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে যে-কোনো গ্রহের দূরত্ব কয়েক কোটি কিলোমিটার—সেখানে ব্যোমযানের মোটরকে প্রথম ২,০০০ কিলোমিটারের মতো (১২০০ মাইলের কিছু বেশী) দূরত্ব পর্যন্ত চালু রাখতে হবে।

মাটির ওপরে একমাত্র রেলগাড়ি একটা ধরাবাঁধা রাস্তা ধরে চলে। অন্য সব গাড়িকেই নাক-বরাবর না গিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে যেতে হয়, কারণ রাস্তা খারাপ থাকে, আবহাওয়া ও জলস্রোতের এদিক-ওদিক হয়, মোটর সবসময়ে একইভাবে চলে না এবং আরো হাজারটা কারণ ঘটে।

কিন্তু মহাশূন্যে ব্যাপারটা একেবারে অন্য রকম। ব্যোমযানটিকে যতোখানি রাস্তা পাড়ি দিতে হবে তার সব জায়গাতেই একটিমাত্র জিনিসের অস্তিত্ব আছে—তা হচ্ছে সূর্যের টান। আর এই টানাপোড়েনে ব্যোমযানটিকে কড়াকড়িভাবে একটি ধরাবাঁধা রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে হবে, যেন ব্যোমযানটি একটি অদৃশ্য রেললাইনের ওপর দিয়ে চলেছে।

মনে হতে পারে যে ব্যোমযানটি যদি তার গতিপথ থেকে সামান্য একটু বেচাল হয়ও তাহলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি নেই, কারণ

মহাশূন্যে যথেষ্ট খালি জায়গা পড়ে আছে এবং অন্য কোনো ব্যোমযানের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাহলেও, জাহাজ বা এরোপ্লেন চালাতে হলে যতোখানি যথাযথ ও সজাগ হওয়া দরকার, মহাশূন্যে ব্যোমযান চালাতে হলে তার চেয়ে অনেক বেশী যথাযথ ও সজাগ হওয়া দরকার। যদি ব্যোমযানের বেগ বা গতিমুখ সামান্য একটু এদিক-ওদিক হয়ে যায় তাহলে তার পরিণতি বড়ো ভয়ঙ্কর হতে পারে। নিচের দৃষ্টান্ত থেকে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

মনে করা যাক, একটি ব্যোমযান চাঁদের দিকে ছুটছে এবং ব্যোমযানটির গোড়ার বেগ যতোটা কম হলে চলে তাই আছে। এখন যদি এই নির্ধারিত বেগ প্রতি সেকেণ্ডে এক মিটার হিসেবে কমে যায় তাহলে ব্যোমযানটি শেষ পর্যন্ত চারহাজার কিলোমিটার (প্রায় আড়াই-হাজার মাইল) পিছিয়ে পড়বে। সাধারণতঃ মহাকাশে ছুট দেবার সময়ে ব্যোমযানের বেগ সেকেণ্ডের দশভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে চার থেকে পাঁচ মিটার পর্যন্ত বেড়ে-বেড়ে চলে—এ অবস্থায় ব্যোমযানটিকে সঠিক পথে চালনা করা যে কত শক্ত তা সহজেই অনুমান করা চলে।

আর অন্য গ্রহের দিকে পাড়ি দিতে হলে কাজটা আরো অনেক বেশী দুরূহ হয়ে যায়। ব্যোমযানের বেগ যদি সেকেণ্ডে এক-মিটার হিসেবে কমে তাহলে তার পরিণতি হিসেবে ব্যোমযানের পাল্লা কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ কিলোমিটার কমে যেতে পারে।

মনে করা যাক, আমরা বৃহস্পতি গ্রহের দিকে যাত্রা করেছি। আমরা এমন একটি গতিপথ বেছে নিয়েছি যার ফলে যাত্রা-শুরুর বেগ হবে সবচেয়ে কম, অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১৪,২২৬ মিটার। এখন এই বেগ যদি সেকেণ্ডে এক মিটার হিসেবে কমে যায় তাহলে ব্যোমযানটি

গন্তব্যস্থান থেকে ৪,০০,০০০ কিলোমিটার (প্রায় ২,৫০,০০০ মাইল) পিছিয়ে পড়বে। যদি ব্যোমযানটিকে চালাবার ব্যাপারে ভুল হয় একহাজার ভাগের একভাগ, তাহলে লক্ষ্যবস্তু থেকে ব্যোমযানটি যতোখানি বেচাল হবে তা মাপতে হবে পঞ্চাশ-লক্ষ কিলোমিটারের (তিরিশ লক্ষ মাইল) মাপে।

যাত্রার সময়ে ব্যোমযানটির গতিপথ যদি এক-ডিগ্রির দশভাগের একভাগ এদিক-ওদিক হয়ে যায় তাহলে ব্যোমযানটি লক্ষ্যবস্তুতে না পৌঁছে দশ-লক্ষ কিলোমিটার (ছয় লক্ষ মাইল) এদিকে বা ওদিকে গিয়ে হাজির হবে।

এ-ধরনের ভুল যাতে না হয় সেজন্য ব্যোমযানের চালকদের সব সময়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং একটি অল্পক্ষমতা-বিশিষ্ট মোটরকে চালিয়ে বা থামিয়ে ব্যোমযানের গতিপথকে সবসময়ে ঠিক রাখতে হবে।

ব্যোমযান কতটা দূরত্ব পার হয়ে এসেছে তা ব্যোমযানের যাত্রীরা কিভাবে জানতে পারবে ?

ব্যোমযানটি যদি চাঁদের দিকে পাড়ি দেয় তাহলে এই দূরত্ব জানা যাবে ব্যোমযান থেকে পৃথিবী ও চাঁদ কতটা কোণাকুণি দেখা যাচ্ছে সেই মাপ থেকে। যতো কম কোণাকুণি দেখা যাবে ততো বেশী দূরত্ব। আর সূর্য থেকে দূরত্ব বোঝা যাবে উত্তাপের তারতম্য থেকে। উত্তাপের তারতম্য যদি এক-ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের দশ-লক্ষ ভাগের একভাগ পরিমাণ হয় তাহলে তা মাপা যায় হাল-আমলের বৈদ্যুতিক থার্মোমিটার দিয়ে। এই থার্মোমিটারের মাপ থেকে সূর্য থেকে দূরত্ব হিসেব করে বার করা সম্ভব হবে এবং সেই হিসেবের মধ্যে দু-তিন কিলোমিটারের বেশী গরমিল হবে না।

ব্যোমযানে জীবনযাত্রা

একশো বছরেরও আগে একটি ইংরেজি পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী জর্জ স্টিফেনসনকে বাদানুবাদে নামতে হয়েছিল। পত্রিকাটিতে লেখা হয় যে ঘোড়ায়-টানা ডাকগাড়ির চেয়েও দ্বিগুণ জোরে রেলগাড়ি চলবে—এমন কথা বলার মতো উদ্ভট ব্যাপার আর কিছু নেই। পত্রিকাটিতে আরো লেখা হয় যে, এই যন্ত্রের কাছে জীবন সঁপে দেওয়া আর রকেটজাত হয়ে শূন্যে পাড়ি দেওয়া—দু'য়ের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, দুই-ই হবে সমান নির্বুদ্ধিতা; উল্‌উইচের নাগরিকেরা এতখানি নির্বোধ হবেন তা আশা করা চলে না।

দেখা যাচ্ছে, ঠাট্টা করে হলেও স্টিফেনসন তাঁর প্রথম ইঞ্জিনের নাম দিয়েছিলেন 'রকেট'। তারপরে যে দৌড় হয়েছিল তাতে 'রকেট' ডাকগাড়ির চেয়েও কয়েক গুণ বেশী জোরে ছুট দেয় এবং তা সত্ত্বেও 'রকেটের' যাত্রীরা নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌছয়।

স্টিফেনসনকে যদি বলা হত যে মানুষ একদিন সত্যি সত্যিই সত্যিকারের রকেটে চেপে বসবে এবং মহাশূন্যের গ্রহ-নক্ষত্র যে-বেগে ছুটছে সেই বেগে রকেটটিও ছুটবে, এবং কয়েকটি বিধিনিষেধ যদি মেনে চলা হয় তাহলে মানুষ সত্যিকারের রকেটে চেপেও স্টিফেনসনের 'রকেটের' যাত্রীদের মতো নিরাপদে মহাশূন্যে যাতায়াত করতে পারবে —তাহলে স্টিফেনসন হয়তো অবাক হয়ে যেতেন।

যাত্রা শুরুর সময়ে ব্যোমযানের বেগ বেড়ে বেড়ে চলে, অর্থাৎ ব্যোমযানের বেগ ত্বরণযুক্ত (accelaration) হয়, তার ফলে ব্যোমযানের যাত্রীদের একটা বাড়তি চাপ সহ্য করতে হয়।

এই বাড়তি চাপ কতখানি রাখা চলবে, তার মানে ব্যোমযানের ত্বরণের মাপ কতখানি রাখা চলবে তা নির্ভর করে মানুষের শরীরের সহ্যক্ষমতার ওপরে। মাধ্যাকর্ষণের টানে যে ত্বরণ আছে ব্যোমযানের ত্বরণ যদি তার চার-পাঁচ গুণ বেশী হয় তাহলে মহাশূন্যে পাড়ি দেবার মতো বেগ অর্জন করতে ব্যোমযানটির কয়েক মিনিট মাত্র সময় লাগবে।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি মানুষের শরীর আরো বেশী বাড়তি চাপ সহ্য করতে পারে—কোনো দ্রুত ছুটন্ত গাড়ি আচমকা থেমে গেলে সেই ট্রেনের যাত্রীকে যেমন সহ্য করতে হয় বা খানিকটা উঁচু থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে সাঁতারুকে যেমন সহ্য করতে হয়। বিমানকে যদি যান্ত্রিক উপায়ে ঠেলা মেরে আকাশে ওড়ানো হয় বা বিমানের কসরৎ দেখানো হয়—তাহলে বৈমানিককে যে বাড়তি চাপ সহ্য করতে হয় তা এর চেয়ে অনেক বেশী।

এ-বিষয়ে আরও জ্ঞানলাভের জন্য কতকগুলো বিশেষ পরীক্ষা করা হয়েছে। যেমন, একটি পরীক্ষা হচ্ছে এই—পাঁচ-মিটার ব্যাসের একটা নাগরদোলায় চাপিয়ে একজন মানুষকে সেকেণ্ডে চোদ্দ মিটার বেগে প্রায় ছ'-মিনিট ধরে পাক খাওয়ানো হয়েছে। মহাশূন্যে যাত্রা করতে হলে মানুষকে যে অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে সেই ধরনের অবস্থা এইভাবে তৈরি করে নেওয়া যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, মানুষটির একেবারেই কোনো ক্ষতি হয়নি।

মানুষের শরীর ত্বরণযুক্ত বেগ কতখানি সহ্য করতে পারবে তা অনেকখানি নির্ভর করে মানুষটি কি অবস্থায় আছে তার ওপরে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, দাঁড়িয়ে বা বসে না থেকে শুয়ে থাকলে মানুষ অনেক বেশী বাড়তি চাপ সহ্য করতে পারে।

আজকাল মানুষের শরীরের সহ্য ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার জন্য জেট-বিমানে বিশেষ ধরনের আসন থাকে। শরীরে যখন বাড়তি চাপ পড়ে তখন এই আসনগুলো লম্বালম্বি হয়ে গিয়ে শরীরকে শোয়া অবস্থায় নিয়ে আসে।

এ ব্যাপারে শরীরচর্চার বিষয়টিকেও বিবেচনা করতে হবে। এমনও শোনা গেছে, ভালোভাবে শরীরচর্চা করলে নিজের শরীরের পনেরো গুণ বেশী বাড়তি চাপ দু-তিন মিনিট ধরে সহ্য করা যায়। শরীরতত্ত্বের দিক থেকে বলা চলে, গ্রহলোকে যাত্রা করতে হলে বা গ্রহলোকের বাইরে যাত্রা করতে হলেও শরীরের এই সহ্যক্ষমতা থাকাই যথেষ্ট।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে রকেট যখন মহাশূন্যে নিজস্ব গতিবেগে ছুটে চলে তখন রকেটের যাত্রীরা ভারশূন্য বোধ করে। শরীরের ভার তখনই টের পাওয়া যায় যখন শরীরটা কোনো কিছুতে বাধা পায় (যেমন, মেঝে বা চেয়ার বা বিছানা ইত্যাদি) এবং বাধা পাবার ফলে শরীরের ওপরে একটা চাপ পড়ে। তাছাড়া, শরীরের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ একে অন্যের ওপরে চাপ দেয় বলেও ওজন টের পাওয়া যায়। যদি এই বাধাটুকু না থাকে তাহলে আর শরীরের ভার টের পাওয়া যায় না।

দৃষ্টান্ত হিসেবে মনে করা যাক যে আমরা একটা বিশেষভাবে তৈরী লিফ্ট্-এ নামছি। লিফ্ট্টি যেন অবাধে নামছে (অর্থাৎ, কোনো রকম যান্ত্রিক উপায়ে লিফ্ট্-এর নামার বেগকে কমানো হয়নি)। এই অবস্থায় লিফ্ট্-এর ভেতরকার সমস্ত জিনিস একই বেগে নিচে নামছে, সুতরাং কোনো কিছুর ওপরেই কোনো কিছুর চাপ নেই। এখন লিফ্ট্-এর কোনো যাত্রী যদি হাতের মুঠোয় ধরা কোনো জিনিসকে মুঠো খুলে ছেড়ে দেয় তাহলেও জিনিসটি মেঝের ওপরে পড়বে না, কারণ জিনিসটির এখন আর কোনো ভার নেই। শুধু সেই

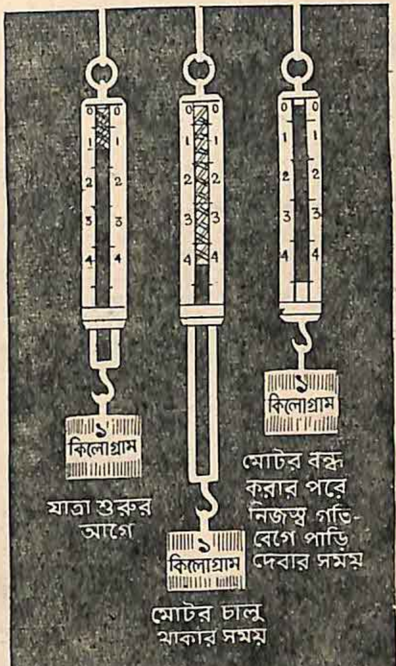
জিনিসটির নয়, লিফ্‌ট্-এর ভেতরকার কোনো কিছুরই ওজন নেই, লিফ্‌ট্-এর যাত্রীটিরও নয়।

আরেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যদি আমরা তিনটি ইট ওপর-ওপর সাজাই তাহলে সবচেয়ে ওপরের ইটটি মাঝখানের ইটের ওপরে খানিকটা চাপ দেবে, আবার মাঝখানের ইটটি সবচেয়ে নিচের ইটের ওপরে চাপ দেবে এর দ্বিগুণ। এবার যদি আমরা তিনটে ইটকেই একসঙ্গে তুলে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলি তাহলে (যতোক্ষণ ধরে ইটগুলো পড়ছে ততোক্ষণ) কোনো ইটেরই অন্য কোনো ইটের ওপরে কোনো চাপ নেই, কারণ কোনো ইট-ই অন্য কোনো ইটের পক্ষে বাধা হচ্ছে না।

পৃথিবীর জীবনেও মাঝে মাঝে আমরা ভারশূন্য অবস্থা টের পাই। যেমন, পাটাতনে দাঁড়িয়ে-থাকা অবস্থা থেকে জলে ঝাঁপ দিলে নিচে পড়ার সময়টুকুতে শরীরের কোনো ওজন থাকে না। বিমান থেকে লাফিয়ে পড়লে প্যারাস্থট খোলার আগে পর্যন্ত শরীরের কোনো ওজন থাকে না। যদি কেউ পকেটে একটা ভারী জিনিস নিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়ে তাহলে যতোক্ষণ ধরে সে অবাধে নিচে পড়ছে ততোক্ষণ সে পকেটের ভারী জিনিসটির অস্তিত্ব টের পাবে না। কোনো স্কি-চালক যদি পাহাড়ের চুড়ো থেকে নিচে নামতে শুরু করে তাহলে তার মনে হবে যেন তার ওজন খানিকটা কমে গেছে। দোলনায় দোলার সময়েও তাই মনে হতে পারে, বিশেষ করে সবচেয়ে উঁচুতে ওঠার পরে নিচে নেমে আসার মুহূর্তটিতে। প্যারাস্থট নামার সময়ে বা বিমানের কসরৎ দেখাবার সময়ে বৈমানিকরা মাঝে মাঝে ভারশূন্য বোধ করে, যদিও তার ফলে তারা ভারসাম্য হারায় না বা বেচাল হয় না।

নভোচারণ সম্পর্কে লেখাপত্রে 'ভার' শব্দটি বলতে সাধারণত বোঝায় এমন একটি শক্তি যা মানুষকে ও যন্ত্রপাতিকে মেঝের ওপরে দাঁড় করিয়ে রাখে। এই শক্তি যদি না থাকে তাহলে কোনো কিছুই কোনো কিছুর ওপরে চাপ দেয় না এবং ফলে সবকিছুই ভারশূন্য হয়ে যায়।

কোনো কোনো গ্রন্থকার বলেন যে ছুটন্ত রকেটের ভেতরে মানুষ বা জিনিসপত্রের ভার 'যেন' বেড়ে বা কমে যায়। এই মতকে আমরা মানতে পারি না, কারণ ভার বাড়ে কি কমে তা ধরা যায় যন্ত্র দিয়ে।



১০নং চিত্র। মহাশূন্যে যাত্রার বিভিন্ন সময়ে একই বস্তুর বিভিন্ন ওজন।

রকেটের ভেতরে কোনো বস্তুর ওজন কি-ভাবে বাড়ে বা কমে তা ১০ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। একটি এক-কিলোগ্রাম (একসেরের কিছু বেশী) ওজনকে স্প্রিং-এর দাঁড়িতে চাপানো হয়েছে। যাত্রা-শুরুর আগে দেখা যাবে, দাঁড়ির কাঁটা এক-কিলোগ্রাম দাগ পর্যন্ত নেমে এসেছে।

কিন্তু যেই মুহূর্তে রকেট শূন্যে ছুট দেয় সেই মুহূর্তে রকেটের ভেতরকার সমস্ত জিনিসের ওজন কয়েক গুণ বেড়ে যায়। মনে করা যাক, চার গুণ বেড়েছে। তাহলে দাঁড়ির কাঁটা এবার চার-কিলোগ্রামের দাগ পর্যন্ত নেমে আসবে। আবার যেই মুহূর্ত থেকে রকেট নিজস্ব গতিবেগে চলতে শুরু করে সেই মুহূর্ত থেকে রকেটের ভেতরকার কোনো ভার থাকে না। তখন দেখা যাবে দাঁড়ির কাঁটাটি শূন্যের দাগে উঠে এসেছে।

মঙ্গলগ্রহ ও শুক্রগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রথম যে ব্যোমযানটি রওনা হবে —এবং এই ব্যোমযানটির যাত্রা শেষ করতে দু-বছরের বেশী সময় লাগার কথা—তার যাত্রীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন, জল ও খাদ্যের যোগান রাখার সমস্যাটি এখনো রয়ে গেছে; এ-বিষয়ে বিপুল গবেষণা দরকার। তাছাড়া ব্যোমযানের যাত্রাপথে বাতাস ও জলকে বিশুদ্ধ করে নেওয়ার সমস্যাও আছে; এ-বিষয়ে আরো বেশী গবেষণা দরকার। তা সত্ত্বেও আসল কথাটা হচ্ছে এই যে এ-সমস্ত সমস্যার সমাধান বাস্তব ক্ষেত্রে এখন আর অসম্ভব ব্যাপার নয়।

নভোচারণের বিপদ

পৃথিবীর ওপরে সবসময়ে উল্কাপাত হচ্ছে এবং একবছর সময়ের মধ্যে আমাদের এই গ্রহের ওপরে কয়েক হাজার উল্কা পড়ে। উল্কা হচ্ছে নানা আকারের লোহার বা পাথরের টুকরো এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার আগে কোনো কোনো উল্কার ব্যাস কয়েক মিটার (এক মিটার হচ্ছে একগজের কিছু বেশী) পর্যন্ত হয়। তবে

উল্কাকণা সম্পর্কে একথাই বলতে হয় যে প্রতি সেকেণ্ডে দশ হাজার থেকে একলক্ষ পর্যন্ত উল্কাকণা পৃথিবীর ওপরে পড়ে। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রতিদিন পৃথিবীর ওপরে যতো উল্কাকণা পড়ছে তার মোট ওজন দশ থেকে কুড়ি টন। আর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে এই কণাগুলোর বেগ সেকেণ্ডে কুড়ি থেকে সত্তর কিলোমিটারের মধ্যে (অর্থাৎ, সেকেণ্ডে বারো মাইল থেকে চুয়াল্লিশ মাইলের মধ্যে)।

বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বাতাসের ঘষা লেগে লেগে উল্কা এতবেশী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে সময়ে সময়ে তা সূর্যের মতো বা সূর্যের চেয়েও বেশী উজ্জ্বল দেখায়। উল্কা যদি মাটির ওপরে আছড়ে পড়ে তাহলে কয়েক কিলোমিটার (এক কিলোমিটার হচ্ছে আধ-মাইলেরও বেশী) গভীর গর্ত হতে পারে।* যদি তেমন আকারের একটি উল্কা এসে ঘা মারে তবে ব্যোমযান ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এমন কি ব্যোমযানের খোলে ছোট্ট একটা ছিদ্র হলেও বিপদ হতে পারে, কারণ সেই ছিদ্র দিয়ে ব্যোমযানের বাতাস শব্দতরঙ্গের বেগে বাইরে বেরিয়ে যাবে। যাই হোক, পরীক্ষা করে দেখা গেছে, শরীরের বাইরের চাপ যদি আচমকা কমে যায় তাহলে প্রায় পনেরো সেকেণ্ড মানুষ জ্ঞান হারায় না। সুতরাং এই সময়টুকুর মধ্যে অনায়াসেই সে স্পেস-স্যুটের (নভোচারণের সময়ে যে বিশেষ ধরনের পোশাক পরতে হয়) অক্সিজেন মুখোশ এঁটে নিতে পারবে।

---

* ১৯০৮ সালের ৩০শে জুন সাইবেরিয়ার জলাভূমিতে একটি উল্কা পড়েছিল। সেই উল্কাপাতের ফলে চারদিকের দু-হাজার বর্গমাইল জুড়ে কল্পনাতীত এক ধ্বংসলীলা চলে। হাজার হাজার গৃহপালিত পশু প্রাণ হারায় আর সেই উল্কাপাতের ফলে যে ঝড় ওঠে তার ফলে সাইবেরিয়ার আট কোটি গাছ খড়ের টুকরোর মতো উড়ে যায়।—বাংলা অনুবাদক

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে দেখলে দেখা যায় এত ছোট ছোট উল্কাকণাও যদি অনবরত ব্যোমযানের ওপরে আছড়ে পড়ে তাহলে ব্যোমযানের খোলস নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেসব কৃত্রিম উপগ্রহ দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর চারদিকে পাক খাবে তাদের পক্ষে এ-ব্যাপারটা বিশেষ বিপদের কারণ হয়ে ওঠে, কারণ কথাতেই আছে—'ফোঁটা ফোঁটা জল পড়লেও পাথর ক্ষয়ে যায়।'*

১৯৫৩ সালে আমেরিকায় এ বিষয়ে একটি পরীক্ষা করা হয়েছিল। ৪০ থেকে ১৪০ কিলোমিটার (২৫ থেকে ৮৫ মাইল) উঁচুতে ১৪৪ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে মোট ৬৬টি উল্কাপাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তার মানে, প্রতি বর্গমিটারে প্রতি সেকেণ্ডে ৪.৯টি উল্কাপাত। অন্যান্য পরীক্ষা থেকে জানা গেছে—একটি পালিশ-করা ধাতুর পাতকে যদি আকাশের অনেক উঁচুতে উঠিয়ে আবার ফিরিয়ে আনা যায়, তারপরে সেই ধাতুর পাতটিকে যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়, তাহলে ধাতুর পাতটির ওপরে ছোট ছোট গর্তের চিহ্ন পাওয়া যাবে। এই গর্তগুলো হয়েছে উল্কাকণার ঘায়ে, যে-সব উল্কাকণা এত ছোট যে সাদা চোখে দেখা যায় না।

উল্কাপাতের বিপদ থেকে ব্যোমযানকে কিভাবে বাঁচানো যায় তার কোনো কার্যকরী উপায় এখনো বার করা যায়নি। তবে এ-বিষয়ে কাজ কিছুটা এগিয়েছে। যেমন, একটা কথা বলা চলে: আমরা জানি, উল্কাপাত সবসময়ে এবং সব-জায়গায় একইভাবে হয় না। এক-একটা সময় আসে যখন বৃষ্টির মতো উল্কাপাত হয়; এই

* সোভিয়েতের এক নম্বর স্পুটনিকটিকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে নিরাপদে পৃথিবী পরিক্রমা করতে দেখে অনেকে অনুমান করেছেন, উল্কাপাতের বিপদটিকে যতো বড়ো বলে ভাবা গিয়েছিল আসলে তা নয়।—বাংলা অনুবাদক

সময়গুলো কখন কখন আসে তা খুঁটিয়ে জানা হয়েছে। তাছাড়া উল্কার ঝাঁকগুলো যেসব কক্ষপথে পরিক্রমা করে, সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা করা হয়েছে। এসব পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা থেকে যা কিছু খবরাখবর পাওয়া গেছে তার ফলে নভোচারণ-বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট সাহায্য হবে; তাঁরা সঠিক গতিপথটি বাছাই করতে পারবেন এবং যাত্রা-শুরুর সঠিক ক্ষণটি স্থির করতে পারবেন। 'উল্কাপাতে বিরতি' ঘটে এমনি এক সময়ে তাঁরা চন্দ্রে গিয়ে পৌছতে পারবেন এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে পারবেন—পথে বড়ো রকমের উল্কার সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগার কোনো ভয় থাকবে না। ব্যোমযানের বাইরের দিকের ধাতুর মোড়কের ওপর এটুকু ভরসা রাখা চলবে যে তা ব্যোমযানটিকে উল্কাকণা থেকে বাঁচাবে আর ব্যোমযানের ভেতরের দিকের খোলসটি ছোটখাটো উল্কাপিণ্ডকে ঠেকাবে।

মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথ ছাড়িয়ে গেলেই ব্যোমযানটির সামনে আরেকটি বিপদ দেখা দেবে—বিপদটি হচ্ছে গ্রহাণুপুঞ্জের কোনো একটির সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগা। এই ক্ষুদ্রতর গ্রহগুলো বা গ্রহাণুপুঞ্জ প্রধানত মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝামাঝি জায়গায় থেকে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। জ্যোতির্বিদ্‌রা এই গ্রহাণুপুঞ্জের ১৬০০টির হদিশ পেয়েছেন এবং তাদের গতিবিধির ছক কেটেছেন।

সৌরমণ্ডলে যতো উল্কা আছে তাদের বস্তুপিণ্ডের মোট পরিমাণ (পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের একহাজার-ভাগের একভাগ) আর এই ক্ষুদ্রতর গ্রহগুলোর মোট বস্তুপিণ্ডের পরিমাণ—এ দুটো মোটামুটি সমান। এই ক্ষুদ্রতর গ্রহগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতমটির ব্যাসও এক-কিলোমিটারের কম হবে না; সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এদের মধ্যে যে কোনো একটির সঙ্গে ধাক্কা লাগলেই ব্যোমযানটি খতম হয়ে যাবে।

ধাক্কা এড়াবার জন্য রাডার-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা চলে। এই রাডারের সাহায্যে সময় থাকতেই সাবধান হওয়া যাবে এবং আপনা থেকেই রকেটটিকে চলার পথ থেকে খানিকটা সরিয়ে আনা যাবে। সমস্যাটি অবশ্যই খুব দুরূহ, কারণ মহাশূন্যে উল্কাপিণ্ডগুলো যে-বেগে ছুটছে তা অতি প্রচণ্ড।

গ্রহজগতের মহাকাশে দু-ধরনের রশ্মি অনবরত চলাফেরা করে। একটি হচ্ছে সূর্যের আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি, অপরটি হচ্ছে যাকে বলা হয় মহাজাগতিক রশ্মি (**cosmic rays**)। ব্যোমযানের বাইরের দিকের ধাতুর মোড়কটি আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিকে পুরোপুরি ঠেকাতে পারবে। কিন্তু মহাজাগতিক রশ্মিকে কোনো কিছু দিয়েই ঠেকানো যায় না, এই সর্বতোসঞ্চারী রশ্মিটি অনায়াসেই ব্যোমযানের ভেতরে ঢুকে পড়বে। এই রশ্মিকে কিভাবে ঠিকমতো ঠেকানো যাবে তা নিয়ে আরো গবেষণা করা দরকার।

মানুষের শরীরে মহাজাগতিক রশ্মির ছোঁয়াচ লাগার ফলাফল জানার জন্য সুইজারল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী ইয়ুগ্‌স্টার একটি পরীক্ষা করেছিলেন। পরীক্ষাটি হচ্ছে এই: একটি উঁচু পাল্লার রকেটের সাহায্যে মানুষের গায়ের একটুকরো সংরক্ষিত চামড়াকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বায়ুমণ্ডলের ওপরকার স্তরে এবং সেখানে চামড়ার টুকরোটিতে মহাজাগতিক রশ্মির ছোঁয়াচ লেগেছিল। রকেটটি মাটিতে ফিরে এলে সেই চামড়ার টুকরোটিকে একটি মানুষের গায়ে সেঁটে দেওয়া হয়। দেখা যায় যে সেই সেঁটে দেওয়া চামড়াটি বেমালুম জোড়া লেগে গেছে। উঁচু-পাল্লার রকেটের সাহায্যে যে-সব গবেষণা করা হয়েছে তাতে জানা গেছে যে খুব অল্প সময়ের জন্য আল্ট্রা-ভায়োলেট ও মহাজাগতিক রশ্মির ছোঁয়াচ লাগলে শুধু যে নিম্নতর

জীবদেরই কোনো ক্ষতি হয় না তা নয়, বানরেরও কোনো ক্ষতি হয় না। যাই হোক, একথা বলে রাখা দরকার যে এখানে যে-সব পরীক্ষার কথা বলা হল তা যে নিশ্চিতভাবে কোনো কিছু প্রমাণ করেছে তা নয়।

পরমাণবিক রকেটের যাত্রীদের জীবনের পক্ষে অন্য একটি বিপদও আছে। তা হচ্ছে পরমাণবিক জ্বালানি থেকে নিঃসৃত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। এই তেজস্ক্রিয়তা ব্যোমযানের কোনো কোনো অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং তার ফলে যাত্রীদের অনিষ্ট হতে পারে। সুতরাং এ-সমস্ত বিকিরণ থেকে যাত্রীদের বাঁচাবার জন্য এমন কিছু আড়ালের ব্যবস্থা করা দরকার যা তেজস্ক্রিয়তাকে ঠেকাতে পারবে।

অবতরণ

ফিরতি-পথে পৃথিবীতে ব্যোমযানের অবতরণ কিভাবে সম্ভব হবে?

এই উদ্দেশ্যে রকেট-মোটরকে ব্যবহার করা চলতে পারে; অন্তত তত্ত্বের দিক থেকে তাতে কোনো বাধা নেই। প্রথমে ব্যোমযানটিকে একবার ডিগবাজি খাওয়াতে হবে (অর্থাৎ, ব্যোমযানের সামনের দিকটা হবে পেছনের দিক, পেছনের দিকটা হবে সামনের দিক)।*

* পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে কোনো বস্তু যখন মাটিতে পড়ে তখন তাকে ডিগবাজি খাওয়ানো যায় না, কারণ বায়ুমণ্ডলটাই সেখানে একটা বাধা। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের বাইরে অবাধ মহাশূন্যে ব্যোমযান যখন নিজস্ব গতিবেগে ছুট দিচ্ছে তখন সেই ব্যোমযানের সামনের দিক বা পেছনের দিক বলে কিছু নেই—ছুটন্ত অবস্থাতেই একটা ফ্লাই-হুইলের সাহায্যে সেই ব্যোমযানকে খুশিমতো ডিগবাজি খাওয়ানো চলে।

—বাংলা অনুবাদক

তারপর রকেটের মোটর চালিয়ে উল্‌টো দিকে একটা ধাক্কা তৈরি করে ব্যোমযানের বেগ কমাতে হবে। কিন্তু এইভাবে ব্যোমযানের বেগ কমাতে হলে যে-পরিমাণ জ্বালানি দরকার হবে তা খুবই বেশী এবং এই বিপুল পরিমাণ জ্বালানি মজুদ রাখার জায়গা রকেটে নেই।

ব্যোমযানের বেগ কমাবার আরেকটি উপায় হচ্ছে বাতাসের বাধাকে কাজে লাগানো। মনে রাখা দরকার যে প্যারাস্থটের সাহায্যে মাটিতে নামার চেষ্টা করা একটা অসম্ভব ব্যাপার, কারণ বাতাসের ঘষা লেগে লেগে প্যারাস্থট এত বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে যে সঙ্গে সঙ্গে তা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে ব্যোমযান যদি মাটিতে নামার চেষ্টা করে সে-ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার ঘটবে। ব্যোমযান আকারে বেশ বড়োসড়ো হয়, তার দেওয়াল হয় পাতলা এবং তার গা স্ট্রীম-লাইন করা থাকে না—স্থতরাং এ-ধরনের ব্যোমযান মাটিতে নেমে আসার পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই এই ব্যোমযানটি উত্তাপে সাদা হয়ে উঠবে। এ অবস্থায় বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরের কাছাকাছি এসে ব্যোমযানের যাত্রীদের এসে বসতে হবে নিখুঁতভাবে স্ট্রীম-লাইন-করা একটি ব্যোমচারী গ্লাইডারে। আর ওদিকে ব্যোমযানটি হয় বায়ুমণ্ডলে উল্কার মতো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, কিংবা যদি ব্যোমযানটিকে একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে ঠেলে দেবার মতো যথেষ্ট জ্বালানি অবশিষ্ট থাকে তাহলে ব্যোমযানটি হয়ে উঠবে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ।

সেকেণ্ডে এগারো কিলোমিটারেরও বেশী (প্রায় সাত মাইল) বেগে ব্যোমচারী গ্লাইডারটি বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ওপরের স্তরে প্রবেশ করবে। সেখানে বাতাসের বাধা পেয়ে পেয়ে গ্লাইডারের বেগ কিছুটা কমার পরে গ্লাইডারটি আবার বেরিয়ে আসবে মহাশূন্যে। এই

কসরতটি বারকয়েক চালাতে পারলেই ব্যোমচারী গ্লাইডারের বাড়তি বেগ ঝরে যাবে এবং তারপরে মাটিতে নামার চেষ্টা করলেও আর এতবেশী উত্তপ্ত হবে না যে তা বিপদের কারণ হতে পারে।

গ্লাইডারের গায়ে যে ডানার 'আভাস' আছে তা এত ছোট যে গ্লাইডারের বেগ কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তা দিয়ে আর কাজ হবে না। ঠিক এই সময়টিতে গ্লাইডারের মুড়ে-রাখা ডানা দুটো খুলে দিয়ে কাজে লাগাতে হবে। গ্লাইডারের বেগ পুরোপুরি কমে যাবার পরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গ্লাইডার মাটিতে নেমে আসবে।

স্পেস স্টেশন বা মহাশূন্যের বিরামস্থান থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হলেও একই উপায়। তবে এক্ষেত্রে অল্পক্ষমতাবিশিষ্ট রকেট-মোটরের সাহায্যে গ্লাইডারটিকে স্পেস-স্টেশন থেকে 'ছুঁড়ে' ফেলা হবে। স্পেস-স্টেশনটি যেদিকে ঘুরছে, গ্লাইডারটিকে ছুঁড়ে দেওয়া হবে তার উল্টো দিকে। ফলে, গ্লাইডারটি এতক্ষণ স্পেস-স্টেশনের সঙ্গে সঙ্গে যে-বেগে ঘুরছিল, উল্টো দিকে ধাক্কা খাবার ফলে সেই বেগ কিছুটা কমে যাবে এবং গ্লাইডারটি আস্তে আস্তে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে।*

---

* দু-নম্বর স্পুটনিকে 'লাইকা' নামে যে কুকুরটি আছে তাকেও এই একই পদ্ধতিতে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে আনার কথা হয়েছিল।—বাংলা অনুবাদক

মানুষের তৈরী উপগ্রহ

গঠন

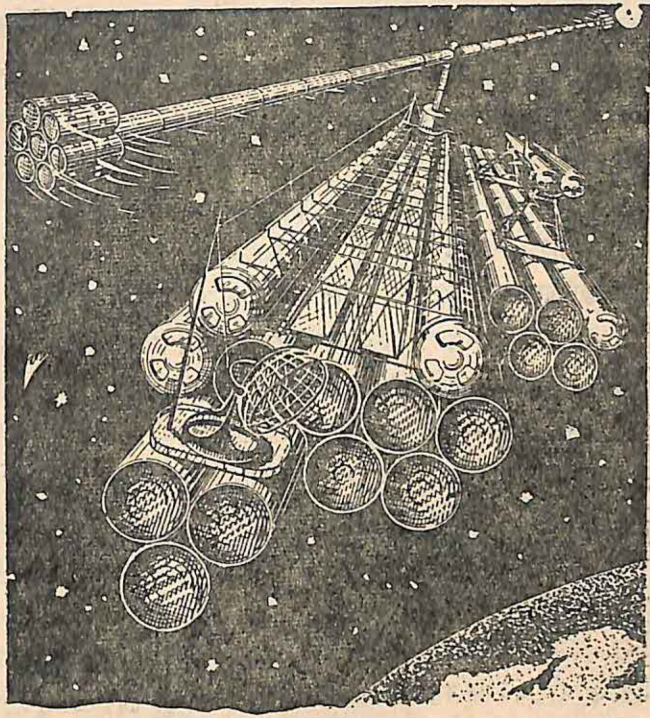
মহাকাশকে জয় করবার প্রথম পর্বে পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করতে হবে। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি হবে উড়ন্ত যন্ত্র-বিশেষ এবং পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্রের মতো পাক খাবে।

ঠিক 'ব্যোমযানে'র মতোই কৃত্রিম উপগ্রহটিকেও তৈরি ও পরখ করতে হবে পৃথিবীতেই। তারপর অংশগুলোকে আলাদা করে নিয়ে আগে-থেকে-ঠিক-করা মহাকাশের বিশেষ একটি কক্ষপথে পাঠানো হবে এবং সেখানে আলাদা আলাদা অংশগুলোকে জোড়া লাগানো হবে (১১ নং চিত্র)।

প্রথম যে তিন বা চার ধাপের রকেট ছাড়া হবে তা যখন নির্ধারিত কক্ষপথে পৌছে পাক খেতে শুরু করবে, তখন ছাড়া হবে দ্বিতীয় রকেটটিকে, তারপরে তৃতীয়, তারপরে চতুর্থ, এমনি পর পর। রকেটগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে মিলে গিয়ে সম্পূর্ণ উপগ্রহটি তৈরি হবে। কেবিন ও জ্বালানি ট্যাঙ্কগুলোকে এমনভাবে তৈরি করা হবে যেন সেগুলোকে থাকার জায়গা, ল্যাবরেটরি, কারখানা ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহার করা চলে।

এই কামরাগুলো হবে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত এবং বাতাস যাতে বাইরে বেরিয়ে যেতে না পারে সেজন্য নিশ্ছিদ্র।

যথাসময়ে স্পেস স্টেশনে প্রয়োজনীয় সমস্ত যন্ত্রপাতি এসে পৌছবে। পৌছবে গ্যাস-টারবাইন, মাপজোখ নেবার যন্ত্রপাতি, থার্মোমিটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। রকেট ওপরে পাঠাবার সময়ে যে জ্বালানি ও



১১নং চিত্র। কৃত্রিম উপগ্রহের সম্ভাব্য গড়ন। কৃত্রিম উপগ্রহের নিচের অংশে কোনো কিছুর ভার নেই, কিন্তু উপরের অংশটিকে পাক খাইয়ে দিয়ে কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ তৈরি করা হয়েছে।

অক্‌সিজেন-যোগানদার ব্যবহার করা হয়েছিল তার যেটুকু বাড়তি থাকবে তাও ব্যবহার করা চলবে।

মানুষজন যাতে অস্বস্তি বোধ না করে সেজন্য স্পেস-স্টেশনে কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে (১১নং চিত্র)।

কৃত্রিম উপগ্রহটিকে পৃথিবী থেকে কতটা উঁচুতে তৈরি করতে হবে?

একথা ঠিক যে উপগ্রহটি পৃথিবীর যতো কাছাকাছি হবে ততোই পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের স্থবিধে। কিন্তু তা করতে গিয়ে উপগ্রহটিকে যদি এত নিচে নামিয়ে আনা হয় যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরের মধ্য দিয়ে উপগ্রহটিকে ছুটতে হবে তাহলে বাতাসে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে উপগ্রহটির বেগ কমে যাবে আর বেগ কমতে কমতে একসময়ে উপগ্রহটি মাটিতে পড়ে যাবে। স্থতরাং উপগ্রহটিকে এমন একটি কক্ষপথে ছুট দেওয়াতে হবে যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘনস্তরের বাইরে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কোথায় শেষ হয়েছে সে-ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো দাগ টানা যায় না। বায়ুমণ্ডলের ওপরের দিক ক্রমেই পাতলা হয়ে গেছে। যেমন, 'এঙ্গেল্‌স্ পীক্' চুড়োয় (৬·৮ কিলোমিটার অর্থাৎ বাইশ হাজার ফুটের কাছাকাছি) বাতাসের ঘনত্ব সমুদ্র সমতলের বাতাসের ঘনত্বের অর্ধেক। দশ কিলোমিটার উঁচুতে বাতাসের ঘনত্ব হয়ে যায় তিনভাগের একভাগ, আর আঠারো কিলোমিটার উঁচুতে তা মাত্র দশভাগের একভাগ। ১৫০ কিলোমিটার (৯০ মাইলের ওপরে) ছাড়িয়ে গেলে যে-বায়ুমণ্ডল আছে তা এত পাতলা যে সেখানে উল্কাপিণ্ডে আগুন ধরে না, যদিও উল্কাপিণ্ড যে-বেগে ছুট দেয় তা কৃত্রিম উপগ্রহের বেগের চেয়ে দশগুণ বেশী হতে পারে। ২০০ কিলোমিটার ছাড়িয়ে গেলে (অর্থাৎ ১২০ মাইলের ওপরে) বাতাস এত পাতলা যে সে-সব জায়গাকে বাতাসশূন্য বলেই ধরে নেওয়া চলে। কৃত্রিম উপগ্রহকে অন্তত এই দুশো কিলোমিটারের উচ্চতায় উঠিয়ে আনাটা যুক্তিযুক্ত।

মাটির দিকে পড়ন্ত বস্তু যেমন পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে মুখ করে পড়ে তেমনি কৃত্রিম উপগ্রহটিও যে-কক্ষপথে ছুটবে সেই কক্ষের কেন্দ্র হবে

পৃথিবীর কেন্দ্র। তার মানে, পৃথিবীর একটি মধ্যরেখা বরাবর ছুটতে হবে কৃত্রিম উপগ্রহকে। সুতরাং কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ এবং পৃথিবীর চারদিকে পাক খাবার সময় নির্ভর করবে—কতটা উঁচুতে থেকে কৃত্রিম উপগ্রহ পাক খাচ্ছে, তার ওপরে।

যদি কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ সামান্য একটু কমে যায় তাহলেই কৃত্রিম উপগ্রহটি কক্ষ থেকে সরে আসবে এবং পাক খেতে-খেতে নেমে আসবে পৃথিবীতে।

কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার

আধুনিক আবহবিদ্যার ভাণ্ডারে এমন তথ্য এখনো যোগাড় হয়নি যাতে আবহাওয়াতে অদল-বদলের প্রক্রিয়াগুলোকে সূত্রাকারে উপস্থিত করা চলে। যোগাড় করতে না পারার কারণ, বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরকে অল্প সময়ের জন্যই পর্যবেক্ষণ করা যায়। এ ব্যাপারে কৃত্রিম উপগ্রহ খুবই কাজের হবে, কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা চলবে।

পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ গড়ার কাজটি এতদূর এগিয়েছে যে আগামী দু'তিন বছরের মধ্যেই এমনি একটি উপগ্রহ তৈরি করা হবে।* এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা এবং আরো কয়েকটি দেশে কাজ হচ্ছে। প্রথম যে কৃত্রিম উপগ্রহটি তৈরি হবে

*দু'তিন বছরও সময় লাগেনি। এই লেখা প্রকাশিত হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তা সম্ভব হয়েছে। এবং একটি নয়, ইতিমধ্যেই দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ—দুটি স্পুটনিক—পৃথিবীকে পাক দিচ্ছে।—বাংলা অনুবাদক

তাতে কোনো মানুষ থাকবে না এবং তার ব্যাস আধ-মিটারের বেশী (এক মিটারে তিন ফুট তিন ইঞ্চি) হবে না। এই উপগ্রহের যন্ত্রপাতিতে যেসব তথ্য ধরা পড়বে সেগুলো রেডিও মারফৎ পাঠানো হবে পৃথিবীতে।

তারপরে যেসব উপগ্রহ তৈরি হবে তাতে থাকবে মানুষজন ও গবেষণাগার। পৃথিবীর উপরিতলকে যাতে ঠিকমতো পর্যবেক্ষণ করা চলে সেই উদ্দেশ্যে এইসব উপগ্রহকে এমনসব কক্ষপথে ছুট দেওয়াতে হবে যা পৃথিবীর দুই মেরুবিন্দুর ওপর দিয়ে যাবে। ফলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ষোলবার এইসব উড়ন্ত গবেষণাগার পৃথিবীকে পাক দেবে এবং দিনের আলোতে পৃথিবীর উপরিতলের সমস্ত অংশের ফটো নিতে পারবে।

আমাদের এই গ্রহের বিস্তৃত এলাকার কোন্ কোন্ জায়গায় কিভাবে মেঘ জড়ো হয়, ঠাণ্ডা ও গরম বাতাসের স্তর কিভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, ঝড় কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে যায়—এসব পর্যবেক্ষণ করার ব্যাপারে সবচেয়ে সুবিধের জায়গা হবে কৃত্রিম উপগ্রহ। বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে বাতাসের উত্তাপ, চাপ ও ঘনত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যাবে এই উড়ন্ত হাওয়া-আপিসে। সূর্যের তেজ-বিকিরণ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হবে এবং তার ফলে আমাদের এই গ্রহ সূর্যতেজের কতখানি অংশ আত্মসাৎ করতে পারছে তা মাঝে মাঝে স্থির করে নেওয়া সম্ভব হবে; তার ফলে আগে থেকেই সঠিকভাবে বলে দেওয়া যাবে, আবহাওয়া কিরকম থাকবে এবং বেতার-বার্তা পাঠাবার পক্ষে আবহাওয়া কতখানি অনুকূল।

কৃত্রিম উপগ্রহে সূর্যের তেজ সবসময়েই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। সিওল্‌কোভস্কির মতে, মহাশূন্যে হট্‌হাউস ব্যবহার করে এই

সূর্যতেজের সাহায্যে শাকসবজি ফলানো যেতে পারে। এইভাবে কৃত্রিম উপগ্রহবাসী মানুষ নিজেদের খাদ্যের জন্য শাকসবজি নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারবে।

সেখানে তৈরি হবে পরমাণবিক গবেষণাগার, আর সেইসব গবেষণাগারে কাজের জন্য প্রচুর পরিমাণে মহাজাগতিক রশ্মি পাওয়া যাবে।

টেলিভিশন ও আল্ট্রা-শর্টওয়েভ ব্রডকাস্টের জন্য অতি চমৎকার জায়গা হবে কৃত্রিম উপগ্রহ।

অন্য গ্রহে যাত্রার সুবিধার জন্য সিওল্‌কোভস্কি প্রস্তাব করেছিলেন যে, যাত্রার ব্যাপারটিকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে এবং পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে ব্যবহার করতে হবে রকেট বদল করবার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে।

মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হলে সরাসরি পৃথিবী থেকে রওনা না হয়ে এই ধরনের একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে রওনা হতে পারলে ব্যাপারটা অনেক সুবিধের হয়ে যায়। চন্দ্রে বা শুক্রগ্রহে বা মঙ্গলগ্রহে পৌঁছতে হলে সেকেণ্ডে ৩·১ থেকে ৩.৬ কিলোমিটার (দু'মাইলের একটু কম বা বেশী) বেগ হওয়াই যথেষ্ট, কারণ প্ল্যাটফর্মটির নিজস্ব একটি বেগ আছে এবং তা হচ্ছে সেকেণ্ডে প্রায় আট কিলোমিটার (প্রায় পাঁচ মাইল)। কিন্তু পৃথিবী থেকে সরাসরি রওনা হতে হলে পৃথিবীর টান ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্য বেগ হওয়া দরকার সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার (প্রায় ৭ মাইল)।

অন্য গ্রহে যাবার জন্য রওনা হয়ে অন্তর্বর্তী একটি স্টেশনে এসে একটি পর্ব শেষ করা—এ ব্যবস্থার কথা মহাশূন্য-পর্যটনের কয়েকটি পরিকল্পনায় বলা হয়েছে।

একটি পরিকল্পনা হচ্ছে এই : পৃথিবী থেকে রওনা হয়ে অন্তর্বর্তী স্টেশনে পৌঁছলে পর রকেটের বাকি পথের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, জ্বালানি ও খাদ্য এই অন্তর্বর্তী স্টেশন থেকে যোগান দেওয়া হবে।

অন্যান্য পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, মহাশূন্যের যাত্রীরা এই অন্তর্বর্তী স্টেশনে এসে রকেট বদল করবে। এবার যে রকেটটিতে যাত্রা শুরু হবে সেটি তৈরি হয়েছে পৃথিবী থেকে পাঠানো অংশ জোড়া লাগিয়ে। যন্ত্রপাতিও এসেছে রকেট মারফৎ।

আরো অনেক দিক থেকে স্পেস্‌-স্টেশনকে কাজে লাগানো যাবে। নভোচারণবিদ্‌রা এখান থেকে পরীক্ষামূলকভাবে পাড়ি দিতে পারবেন যাতে ভবিষ্যতে ঠিক কোন্‌ কোন্‌ অবস্থার মধ্যে মহাশূন্যে যাত্রা শুরু হবে সে-সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায়। এখানে নানা বিষয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হবে ; যেমন, দীর্ঘকাল ভারশূন্য অবস্থায় থাকলে মানুষের কোনো অনিষ্ট হয় কিনা, মাধ্যাকর্ষণ টানের মতো একটি টান তৈরি করে তার মধ্যে বসবাস করলে মানুষের অবস্থা কেমন হয়, ইত্যাদি। এখানে অন্য একটি বিষয়েও গবেষণা করা সম্ভব হবে ; তা হচ্ছে, উল্কাপাতের বিপদ থেকে বাঁচবার উপায় কি হতে পারে তা উদ্ভাবন করা। ভবিষ্যতের মহাশূন্য-যাত্রীরা এই অন্তর্বর্তী স্টেশনকে ব্যবহার করবে একটা ঘাঁটি হিসেবে যেখানে সে মহাশূন্যে রকেট চালাবার জটিল বিদ্যাটিকে আয়ত্ত করবে।

ব্যোমযান ও গ্লাইডারকে কিভাবে তৈরি করলে সবদিক থেকে ভালো হয় সে-সম্পর্কে সমস্ত তথ্য বিজ্ঞানীরা জানতে পারবেন।

কারও কারও মতে খোদ চন্দ্রকেই অন্তর্বর্তী স্টেশন হিসেবে ব্যবহার করা চলবে। কিন্তু এই মতটি যথার্থ নয়, কারণ চন্দ্রের দূরত্ব আমাদের এই গ্রহ থেকে খুবই বেশী। তাছাড়া, চন্দ্রের বস্তুপিণ্ড নিতান্ত কম নয়,

ফলে চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের টান অপেক্ষাকৃত বেশী। সুতরাং ব্যোমযানকে চন্দ্রে নামতে হলে এবং তারপর আবার চন্দ্র ছাড়িয়ে পাড়ি দিতে হলে বেশ খানিকটা জ্বালানি খরচ করতে হবে।

আবার এমনও হতে পারে, আমরা এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারিনি যে এই চন্দ্রের চেয়ে ছোট আরেকটি চন্দ্র আছে পৃথিবীর, বা, এমন কি, গোটাকতক ছোট ছোট স্বাভাবিক উপগ্রহ? এইসব স্বাভাবিক উপগ্রহের কোনো একটিতে উড়ন্ত গবেষণাগার গড়ে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ।

কথাটা যদি সত্যি হয়, অর্থাৎ সত্যিই যদি এ-ধরনের উপগ্রহ থাকে, তবে তারা এত ছোট যে তাদের হদিশ পাওয়া খুবই শক্ত। যদি একটি ক্ষুদে উপগ্রহ পৃথিবী থেকে অল্প দূরত্বে প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীকে পাক দেয় তবে এই বেগের প্রচণ্ডতার জন্যই উপগ্রহটি দূরবীক্ষণের মধ্যে ধরা পড়ে না। সুতরাং পৃথিবীর একটি স্বাভাবিক উপগ্রহে মহাশূন্য-যাত্রার অন্তর্বর্তী স্টেশনটি গড়ে তোলা হবে—সে-সম্ভাবনা খুবই কম।

মহাশূন্যে পর্যটন

চন্দ্রে যাত্রা

একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে মহাশূন্যে পর্যটন শুরু করার প্রথম ধাপে চন্দ্রেই হবে প্রথম গন্তব্যস্থান। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ৩,৮৪,০০০ কিলোমিটার (২,৩৮,৮৪০ মাইল), অর্থাৎ, শুক্রগ্রহ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আসে তখন শুক্র থেকে পৃথিবীর যা দূরত্ব, সেই দূরত্বের একশো ভাগের একভাগ। এমন কি পৃথিবীতেও এই দূরত্বটা খুব বেশী নয়; রেলে ও জাহাজে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এই দূরত্ব পার হয়েছেন, বিমানে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্ব পার হয়েছেন।

মানুষ সবচেয়ে উঁচু পর্বতের চুড়োয় উঠতে পারে। কিন্তু যদি পৃথিবী থেকে চন্দ্র বরাবর একটি মই তৈরি করে দেওয়া যায় তাহলে কি সে সেই মই বেয়ে চন্দ্রে পৌছতে পারবে?

নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ১৫৫০ মিটার (৫০০০ ফুটের কিছু বেশী) উঁচুতে উঠতে একটি পুরো দিনের পরিশ্রম দরকার। এই হিসেবে চন্দ্রে পৌছতে ৬৮০ বছর লাগার কথা। কিন্তু এই হিসেবের মধ্যে এই অনুমান করা হয়েছে যে যাত্রার প্রথম দিনে যে-অবস্থা ও যে-বেগ ছিল, শেষ দিন পর্যন্ত তাই থেকেছে। অনুমানটি ঠিক হলে তবেই হিসেবটি টেকে। কিন্তু এই অনুমান ঠিক নয়। যাত্রী যতোই ওপরের দিকে উঠবে ততোই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান কমবে। আর যতো টান কমবে ততোই চলার বেগ বাড়বে এবং তার ফলে এগারো বছরের মধ্যে তার যাত্রা সম্পূর্ণ হবে।

কিন্তু যাত্রা যদি রকেটে হয়? তাহলে চন্দ্রে পৌছতে কত সময় লাগবে? সেকেণ্ডে ১১'২ কিলোমিটার (প্রায় ৭ মাইল) বেগে যদি একটি রকেট পৃথিবী ছাড়িয়ে ছুট দেয় তাহলে সেটির গন্তব্যস্থানে পৌছতে সময় লাগবে ৫১ ঘণ্টা।

শুধু প্রথম কয়েকটি উপগ্রহ নয়, চন্দ্রের দিকে গোড়ায় যেসব রকেট রওনা হবে তারাও নিয়ন্ত্রিত হবে রেডিও মারফৎ। এইসব রকেট থেকে যে বেতারবার্তা পৃথিবীতে এসে পৌছবে তা থেকে বিজ্ঞানীরা রকেটগুলোর গতিবিধি সম্পর্কে হদিশ রাখতে পারবেন। রকেটের মধ্যে থাকবে বিস্ফোরক পাউডার এবং রকেটটি চন্দ্রে উপরিতলে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ঝলক দেখা দেবে। এই ঝলক দেখেই বিজ্ঞানীরা জানতে পারবেন, রকেটটি ঠিক কোন্ মুহূর্তে চন্দ্রের ওপরে আছড়ে পড়েছে। পৃথিবী থেকে এই ঝলক বিশেষ করে পরিষ্কার দেখা যাবে যদি চন্দ্রের যে-অংশ অন্ধকারে রয়েছে সেই অংশের ওপরে রকেটটি আছড়ে পড়ে। তা ছাড়া এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে যে অনেকখানি অংশ জুড়ে রকেট থেকে সাদা পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া হবে, যা দেখা যাবে পৃথিবী থেকে।

পরের পর্বে মহাশূন্যের অন্তর্বর্তী স্টেশন থেকে রকেট রওনা হবে চন্দ্রের দিকে। এইসব রকেট হবে অনেক বেশী ক্ষমতাশালী আর তাতে মানুষ থাকবে। এই রকেটগুলোকে এমনভাবে চালানো যেতে পারে যে চন্দ্রের কাছাকাছি এসে এরা হয়ে উঠবে চন্দ্রের কৃত্রিম উপগ্রহ এবং সে-অবস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে চন্দ্রের চারধারে পাক খেয়ে চলবে। এভাবে পাক খাওয়ার জন্য কোনো জ্বালানি খরচ হবে না। কাজেই এ-ধরনের একটি রকেট থেকে চন্দ্রকে পর্যবেক্ষণ করা খরচের দিক থেকে খুবই স্ববিধের।

হিসেব করে দেখা গেছে যে পৃথিবীর কোনো একটি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে যদি দশ টন ওজনের একটি রকেট চন্দ্রের দিকে যাত্রা করে চন্দ্রকে পাক খেয়ে আসে আর রকেটটির নিষ্ক্রমণ-বেগ যদি সেকেণ্ডে চার কিলোমিটার (আড়াই মাইল) হয় তাহলে বারো টনের বেশী জ্বালানি লাগবে না। যদি পৃথিবী থেকে যাত্রা করতে হয় তাহলে ১৫০ টন জ্বালানি সঙ্গে নিতে হবে। যদি নিষ্ক্রমণ-বেগ হয় সেকেণ্ডে ২.৫ কিলোমিটার (দেড় মাইল) তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে জ্বালানি লাগবে ২৫ টন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৮৪০ টন। এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে ব্যোমযানটি রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরো বেগে ছুট দিচ্ছে, বাতাসের বাধা অতিক্রম করবার জন্য বাড়তি জ্বালানি খরচ করতে হচ্ছে না।

পৃথিবী থেকে চন্দ্রের মাত্র একটি গোলার্ধ দেখা যায়। সুতরাং অপর গোলার্ধটির পর্যবেক্ষণ বৈজ্ঞানিক দিক থেকে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এই অপর গোলার্ধটির পুরো অংশে যখন সূর্যের আলো এসে পড়ে, অর্থাৎ অমাবস্যার সময়ে, তখন এই গোলার্ধের ওপর দিয়ে পরিক্রমা করা যেতে পারে।

ধরে নেওয়া যেতে পারে যে চন্দ্রের যে-গোলার্ধ পৃথিবী থেকে দেখা যায় না তার সঙ্গে অন্য গোলার্ধের মৌলিক কোনো তফাৎ নেই। সম্ভবত দুই গোলার্ধই একই ধরনের শুষ্ক ও জলহীন, বাতাস বলতে যেটুকু আছে তা না থাকারই মতো। আশা করা যেতে পারে, চন্দ্রের এই অপর গোলার্ধেও যাত্রীরা দেখবে মস্ত মস্ত কালো জায়গা যেখানে রয়েছে উপত্যকা বা তথাকথিত 'সমুদ্র'; থাক্-থাক্ পর্বত আর গভীর খাদ, পর্বতের চুড়োয় উজ্জ্বল আলো কিন্তু তলার দিকে পুরোপুরি অন্ধকার; চওড়া-চওড়া আর খাঁজ-কাটা-কাটা চক্রাকার ঢিবি, যেগুলোর ভেতরের দিক একেবারে খাড়া কিন্তু বাইরের দিক ক্রমেই

চালু হয়ে গেছে (তথাকথিত 'সার্কাসক্ষেত্র') ; সারি সারি আগ্নেয়গিরির মুখ আর বরফের মতো সাদা আগ্নেয়গিরির ভস্মের চোখ ঝলসানো ফালি ('আলোর রশ্মি')।

মনে করা যাক, ৮নং চিত্রে যে ব্যোমযানটি দেখানো হয়েছে সেটি মহাশূন্যের অন্তর্বর্তী কোনো স্টেশন থেকে চন্দ্রকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য যাত্রা করেছে (৮নং চিত্র, '১')।

যাত্রা শুরু করার পরেই ব্যোমযানটি নিজস্ব বেগে এগিয়ে চলে কিন্তু সেই বেগ বরাবর একই রকম থাকে না। যাত্রার শুরুতে ব্যোমযানটিকে প্রচণ্ড বেগে পাঠানো হয় বটে কিন্তু ওপর দিকে ছুঁড়ে-মারা ঢিলের মতো ক্রমেই ব্যোমযানের বেগ কমতে থাকে। পাঁচ দিন পরে ব্যোমযানটি এমন এক জায়গায় এসে পৌছয় যেখানে চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের টান আছে। এই ব্যাপারটি যেই ঘটে অমনি ব্যোমযানের বেগ বাড়তে শুরু করে এবং চন্দ্রের উপরিতল থেকে কয়েক কুড়ি কিলোমিটার দূরে থাকতেই ব্যোমযানের বেগ সেকেণ্ডে ২˙৫ কিলোমিটার (দেড় মাইল) মাপে পৌছে যায়।

ব্যোমযানটিকে যদি চন্দ্র থেকে দশ কিলোমিটার (ছ' মাইলের কিছু বেশী) উচ্চতায় চন্দ্রের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ হতে হয় তাহলে ব্যোমযানটির বেগ কমিয়ে সেকেণ্ডে ১˙৭ কিলোমিটার (এক মাইলের কিছু বেশী) মাপে আনা দরকার। এই বিশেষ উচ্চতায় এই হচ্ছে চক্রবেগ (৮নং চিত্র, '২')। এই অবস্থায় চন্দ্রকে একবার পাক খেতে ব্যোমযানটির সময় লাগবে ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিট এবং যে-কোনো জায়গা থেকে চন্দ্রের উপরিতলের ১৮৬ কিলোমিটার (প্রায় ১১২ মাইল) পর্যন্ত জায়গা দেখা যাবে। আর যেসব জিনিস লম্বায় অন্তত তিন মিটার (সোয়া তিন গজ), সেগুলোকে সাদা চোখেই দেখা যাবে।

যতোদিন খুশি ব্যোমযানটি চন্দ্রের চারদিকে পাক খাবে এবং সেজন্য এককোঁটা তেলও খরচ হবে না (৮নং চিত্র, '৩')।

তারপর যখন পৃথিবীর দিকে ফিরে আসার সময় হবে তখন ব্যোমযানের যাত্রীরা ব্যোমযানের মোটরকে চালু করবেন। ফলে ব্যোমযানের বেগ বাড়বে আর বেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমযানটি চক্রাকার কক্ষ ছেড়ে আসবে। অবশ্য ব্যোমযান থেকে খসে-পড়া জ্বালানি-ট্যাঙ্কগুলো আগেকার মতোই পাক খেয়ে চলবে (৮নং চিত্র, '৪')। এই ট্যাঙ্কগুলোর মধ্যে বসানো থাকবে কতকগুলো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আর এসব যন্ত্রে যে-সমস্ত মাপজোখ ধরা পড়বে তা বেতার মারফৎ নিয়মিতভাবে পাঠানো হবে পৃথিবীর দিকে।

ব্যোমযানটি কিভাবে পৃথিবীতে নামবে তা আগেই বলা হয়েছে (৮নং চিত্র, '৫')। ব্যোমচারী গ্লাইডারটি পৃথিবীতে নেমে আসবে ডানাছুটোকে পুরোপুরি ছড়িয়ে দিয়ে (৮নং চিত্র, '৬')।

চন্দ্রকে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারার পরে চন্দ্রের মাটিতে নামার চেষ্টা করতে হবে। জালানি খরচ না করে চন্দ্রের মাটিতে নামা সম্ভব কি? চন্দ্রে কি বায়ুমণ্ডল আছে?

পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে যে চন্দ্রের বায়ুমণ্ডল খুবই পাতলা। গোড়ার তথ্য থেকে জানা যায় যে চন্দ্রের উপরিতলে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে (এক সেন্টিমিটার হচ্ছে এক-ইঞ্চির পাঁচ-ভাগের প্রায় ছু-ভাগ) যতোখানি বাতাস আছে তা পৃথিবীর উপরিতলে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে যতোখানি বাতাস আছে তার ছু-হাজার ভাগের একভাগ। পৃথিবীর ষাট কিলোমিটার (প্রায় আটত্রিশ মাইল) ওপরে বাতাসের যা ঘনত্ব, চন্দ্রের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব তাই। যাই হোক না কেন, ব্যোমযানকে চন্দ্রের মাটিতে নামাবার আগে

ব্যোমযানের বেগ কমাবার জন্য চন্দ্রের বায়ুমণ্ডলকে ব্যবহার করা যেতে পারে—এমন সম্ভাবনা কোনো দিক দিয়েই নেই। এ অবস্থায় ব্যোমযানের বেগ কমাবার জন্য রকেটের মোটর চালু করে তাকে একটা ব্রেক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

চন্দ্রে বা অন্যান্য যেসব গ্রহে বায়ুমণ্ডল নেই সেখানে মহাশূন্যের যাত্রীদের থাকতে হবে এমন সব কামরার মধ্যে যেখান থেকে বাতাস বেরিয়ে যাবার ছিদ্র নেই। আর যদি বাইরে বেরোতে হয় তো স্পেস-স্যুট পরতে হবে। কিন্তু এই জবড়জঙ্গ পোশাক পরে থাকা সত্ত্বেও যাত্রীরা স্বচ্ছন্দে চলেফিরে বেড়াতে পারবে। কারণ চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের টান পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানের ছ-ভাগের একভাগ।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্য যতোখানি শক্তিক্ষয় করা দরকার তার কুড়ি ভাগের একভাগ শক্তিক্ষয় করলেই চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণের টান ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা যাবে। তার মানে পৃথিবী থেকে নিষ্ক্রমণ-বেগের চেয়ে চন্দ্র থেকে নিষ্ক্রমণ-বেগ অনেক কম। সঠিকভাবে বলতে গেলে, সেকেণ্ডে ২·৫ কিলোমিটারের (দেড় মাইলের একটু বেশী) চেয়েও কম। হাল আমলের তরল জ্বালানির রকেট এর চেয়েও বেশী বেগে ছুট দিতে পারে।

মঙ্গলগ্রহে যাত্রা

মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দিতে পারলেও ব্যাপারটা খুবই কৌতূহলের হবে। গত তিনশো বছর ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের নজর বিশেষভাবে পড়েছে এই গ্রহটির দিকে, কারণ এই গ্রহটি পৃথিবীর

খুবই কাছে এবং প্রাকৃতিক দিক থেকে এই গ্রহটির সঙ্গে পৃথিবীর মিল আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও মঙ্গলগ্রহের প্রতিবিম্ব খুবই ছোট দেখায়; সেই প্রতিবিম্ব দেখে মঙ্গলগ্রহের উপরিতলকে জানার চেষ্টা করেন বিজ্ঞানীরা—কিন্তু এইটুকু জেনেই তাঁরা এখন আর খুশী থাকতে পারছেন না।

চন্দ্রের বেলায় যা হয়েছে মঙ্গলগ্রহের বেলায় সম্ভবত তাই হবে। অর্থাৎ, মঙ্গলগ্রহের মাটিতে নামার চেষ্টা করার আগে গ্রহটির চারদিক পর্যবেক্ষণ করা হবে। তা করতে হলে ব্যোমযানটিকে কিছুকালের জন্য হতে হবে মঙ্গলগ্রহের একটি উপগ্রহ। সত্যি কথা বলতে কি, মাটিতে নামা এবং মাটি থেকে উঠে আসা—এটা মহাশূন্য-পর্যটনের গোড়ার দিকে একটা চূড়ান্ত রকমের দুরূহ ব্যাপার হয়েই থাকবে। সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে এই যে ফিরতি-পথের জন্য জ্বালানি নিয়ে আসতে হবে সেই পৃথিবী থেকেই। মঙ্গলগ্রহের উপরিতলকে খুঁটিয়ে জানতে পারলে দুটো কাজ হবে। মঙ্গলগ্রহের মাটিতে নামার উপযুক্ত জায়গা বাছাই করা সম্ভব হবে আর এমন সব তথ্য পাওয়া যাবে যার হদিশ পাওয়া পৃথিবী থেকে সম্ভব নয় এবং মঙ্গলগ্রহের মাটিতে নামার অভিযান শুরু করতে হলে যে-তথ্যগুলো জানা দরকার।

প্রথমেই অনুসন্ধান করে দেখতে হবে, মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলের গঠন ও গড়ন এমন কিনা যা ব্যবহার করে ব্যোমযানের বেগ কমানো যেতে পারে। এ-ধরনের অনুসন্ধান-কার্য থেকে অন্য একটা ব্যাপারও জানা যাবে। তা হচ্ছে—এই গ্রহ মানুষের বাসযোগ্য কিনা, এবং এই গ্রহের বায়ুমণ্ডল এমন কিনা যে অনিষ্টকর বিকিরণ থেকে ও বাইরের মহাশূন্য থেকে ছুটে-আসা অসংখ্য 'উল্কা' থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার আছে।

এই তথ্যটি আবিষ্কৃত হয়েছে যে মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে যেটুকু 'ওজোন' (ozone) আছে তা না থাকারই মতো। ওজোন সূর্যের আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিকে শুষে নেয়। মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে ওজোন নেই বলে সূর্যের আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে মাটি পর্যন্ত পৌছে যায়। এই আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতে মহাশূন্য-যাত্রীদের জীবন বিপন্ন হতে পারে।

মঙ্গলগ্রহের চারদিকে একবার ঘুরে আসার জন্য বিভিন্ন গতিপথ অনুসরণ করা যেতে পারে। যে বিশেষ গতিপথটি বেছে নেওয়া হবে, তারই ওপর নির্ভর করছে ব্যোমযানটির গোড়ার বেগ কি হবে এবং মঙ্গলগ্রহে পৌছতে কতখানি সময় লাগবে।



১২নং চিত্র। দু' বছরে মঙ্গলগ্রহকে পাক খেয়ে ঘুরে আসা; (উপরে কোণে) পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে রকেটের যাত্রা-শুরু।

মনে করা যাক, ব্যোমযানটি যে বিশেষ গতিপথে মঙ্গলগ্রহের দিকে রওনা হবে তাতে দু-বছর সময় লাগার কথা (১২নং চিত্র এই গতিপথটির কথা বিবেচনা করা যাক। স্থানীয় সময়ের রাত ঠিক বারোটার সময়ে—যখন পৃথিবী, সূর্য ও স্পেস-স্টেশনের কেন্দ্র একই সরলরেখায় থাকে—তখন রকেটটি রওনা হবে অন্তর্বর্তী এই স্পেস-স্টেশন থেকে। ব্যোমযানটির রওনা হবার এই হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়, কারণ ঠিক এই বিশেষ সময়েই স্পেস-স্টেশন যেদিকে ছুটছে আর ব্যোমযানকে যেদিকে ছুটতে হবে তা মিলে যায়। তার মানে, স্পেস-স্টেশনের বেগ ব্যোমযানের মধ্যেও সঞ্চারিত হচ্ছে, সুতরাং ব্যোমযানের নিজস্ব বেগ সবচেয়ে কম মাপের, অর্থাৎ সেকেণ্ডে ৪·৩ কিলোমিটার (প্রায় ২·৭ মাইল) হলেও চলে। কিন্তু ব্যোমযানটিকে যদি সরাসরি পৃথিবী থেকে ছুট দিতে হত তাহলে ব্যোমযানটির বেগ হওয়া দরকার ছিল সেকেণ্ডে ১২·৩ কিলোমিটার (প্রায় ৭·৭ মাইল)।

১০ টন ওজনের একটি রকেট যদি সেকেণ্ডে চার কিলোমিটার নিষ্ক্রমণ-বেগে স্পেস-স্টেশন থেকে পাড়ি দেয় তাহলে জ্বালানি লাগবে ১৯·৬ টন, আর যদি সরাসরি পৃথিবী থেকে পাড়ি দেয় তাহলে জ্বালানি লাগবে ২১৬ টন।

এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাত্রাকালে মহাশূন্যে রকেটের বেগ অনবরত বদলাবে। পৃথিবী থেকে যাত্রা-শুরুর সময়ে বেগ হবে সবচেয়ে বেশী, আর পৃথিবীর কক্ষ থেকে রকেটটি যতোই দূরে সরে যাবে ততোই রকেটের বেগ কমবে।

মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি এসে রকেটটি মঙ্গলগ্রহের পাশ কাটিয়ে বাইরের মহাশূন্যে বেরিয়ে যাবে। আর মঙ্গলগ্রহের ওপর দিয়ে যাবার

সময়ে যাত্রীরা মঙ্গলগ্রহের উপরিতলের পুরো অংশের ফটো নিতে পারবে, কারণ মঙ্গলগ্রহ লাট্টুর মতো পাক খাচ্ছে।

যাত্রা-শুরুর একবছর পরে ব্যোমযানটি এসে হাজির হবে গতিপথের সবচেয়ে দূরের বিন্দুটিতে। পৃথিবী থেকে এই বিন্দুটির দূরত্ব ২·১৭৫ জ্যোতিষিক একক। এই বিন্দুতে ব্যোমযানটির বেগ হবে সবচেয়ে কম।

এই বিন্দুটি পার হয়ে যাবার পরে ব্যোমযানটির বেগ আবার বাড়বে এবং এই বেড়ে-যাওয়া বেগে মঙ্গলগ্রহের কক্ষের দিকে আবার এগিয়ে যাবে। কিন্তু এবারে মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে ব্যোমযানের সাক্ষাৎ হবে না। ব্যোমযানটির উপবৃত্তাকার গতিপথ শেষ পর্যন্ত শেষ হবে যাত্রা-শুরুর বিন্দুতে; অর্থাৎ ব্যোমযানটি যে-বেগে পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেই একই বেগে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে।

মঙ্গলগ্রহের দুটি উপগ্রহ আছে—ফোবোস ও দেইমোস। আরও শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে এই দুটি উপগ্রহের একটিতে নামা চলতে পারে এবং সেখান থেকে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা চালানো যেতে পারে। মঙ্গলগ্রহকে একবার পাক দিতে দেইমোস-এর সময় লাগে ত্রিশ ঘণ্টার একটু বেশী আর মঙ্গলগ্রহ থেকে দেইমোস-এর দূরত্ব হচ্ছে ২৩,০০০ কিলোমিটার (১৫,০০০ মাইল), অর্থাৎ পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্বের সতেরো ভাগের একভাগ। মঙ্গলগ্রহ থেকে ফোবোস-এর দূরত্ব হচ্ছে মাত্র ৯,০০০ কিলোমিটার (৫,৮২৮ মাইল), আর আট ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে এই উপগ্রহটি মঙ্গলগ্রহকে একবার পাক খায়। এই উপগ্রহ দুটির আয়তন ও ভর খুবই সামান্য, সুতরাং এই উপগ্রহ দুটির মাধ্যাকর্ষণের টান প্রায় কিছুই নয়। এ অবস্থায় মূল গ্রহে না গিয়ে এই উপগ্রহ দুটির যে-কোনো একটিতে গিয়ে হাজির হওয়া অনেক বেশী সুবিধের।

আধুনিক জ্যোতিঃ-পদার্থবিদ্যা যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছে তা থেকে এই অনুমান করা চলে যে পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে মিল আছে এমন প্রাকৃতিক অবস্থা যদি গ্রহমণ্ডলীর কোনো একটি গ্রহে থাকে তবে তা সবচেয়ে বেশী আছে মঙ্গলগ্রহে। জি. তিখোভের পরিচালনায় সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এবিষয়ে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করেছেন এবং তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌচেছেন যে মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদ আছে। তাঁদের নিশ্চিত ধারণা যে মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন আছে এবং মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে এমন কোনো গ্যাস নেই যা মানুষের শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর, যদিও মঙ্গলগ্রহের মাটির কাছাকাছি জায়গাতে পর্যন্ত এই বায়ুমণ্ডল খুবই পাতলা। সুতরাং মঙ্গলগ্রহে পৌছে নভোচারণবিদদের এমন সব কামরায় থাকতে হবে যা থেকে বাতাস বেরিয়ে যাবার ছিদ্র নেই এবং কামরার ভেতরকার বাতাসের চাপ ও তাপ নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা থাকবে। ব্যোমযান থেকে বাইরে যেতে হলে স্পেস-স্যুট পরতে হবে। সম্ভবত মঙ্গলগ্রহে জলও পাওয়া যাবে। সূর্যের তেজ মঙ্গলগ্রহের ওপরে যতোখানি এসে পড়ে তা পৃথিবীর তুলনায় অর্ধেক, ফলে মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়া পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশী নির্মম।

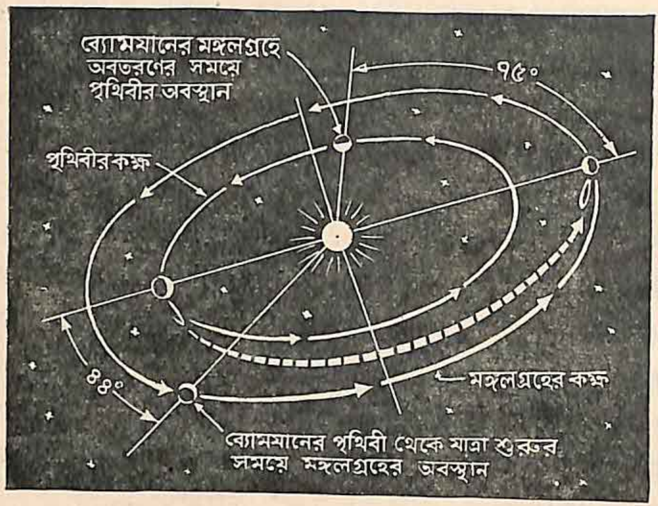
মঙ্গলগ্রহের মাটিতে যদি নামতে হয় তাহলে কোন্ গতিপথ ধরে পাড়ি দিলে খরচের দিক থেকে সবচেয়ে সুবিধের?

মহাশূন্যের দুটি বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে কম দূরত্ব হচ্ছে সেই দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী সরলরেখা। কিন্তু পাখি যেমন সরলরেখায় উড়ে যেতে পারে, ব্যোমযান তেমনভাবে পাড়ি দিতে পারে না। মাটি থেকে আকাশের দিকে একটি পাথর কোণাকুণি ছুঁড়লে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে পাথরের গতিপথ যেমন বেঁকে যায়, তেমনি মহাশূন্যে ব্যোমযানের

চলার রাস্তাও সূর্যের টানে বেঁকে যাবে। অবশ্য একথা সত্যি যে মোটরকে সবসময়ে চালু রেখে ব্যোমযানের গতিপথকে সিধে রাখা চলে, কিন্তু তা করতে গেলে জ্বালানির খরচ খুব বেশী পড়ে যাবে। সূর্যের টানে ব্যোমযানের সিধে গতিপথ একটুও বেঁকবে না—তা একটিমাত্র ক্ষেত্রেই সম্ভব : যদি ব্যোমযানটি সূর্যকিরণের সমান্তরাল-ভাবে খাড়া লাইনে ছুট দেয়। কিন্তু ব্যোমযানকে এভাবে ছুট দেওয়াতে হলে জ্বালানির খরচ অসম্ভব বেশী। তার কারণ এই : রওনা হবার আগে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমযানটিও সূর্যের চারদিকে পাক খাচ্ছিল আর সেই পাক খাওয়ার বেগ ছিল প্রচণ্ড—সেকেণ্ডে ত্রিশ কিলোমিটার (সাড়ে আঠারো মাইল)—সুতরাং ব্যোমযানকে খাড়া লাইনে ছুট দেওয়াতে হলে এই প্রচণ্ড বেগকে ঠেকানো দরকার। যেমন ঠেকানো দরকার নদীর স্রোতকে যদি নৌকোকে ঠিক সিধে লাইনে নদী পার করাতে হয়।

তবুও মনে করা যাক, সবচেয়ে কাছের ও সবচেয়ে সিধে রাস্তায় মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেওয়া হচ্ছে। তাহলে মঙ্গলগ্রহে পৌছতে সময় লাগবে ৮৫ দিন। কিন্তু এজন্য ব্যোমযানটিকে সেকেণ্ডে অন্তত ৩৯ কিলোমিটার (প্রায় ২৪ মাইল) বেগে ছুট দেওয়াতে হবে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এই রাস্তায় মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেওয়াটা অসম্ভব একটা খরচের ব্যাপার।

অন্য দিকে, ব্যোমযানটিকে যদি একটি অর্ধ-উপবৃত্তাকার গতিপথ ধরে ছুট দেওয়ানো হয় তাহলে ব্যোমযানটি যে-বেগে পৃথিবী ছাড়িয়ে ছুট দেবে তা হবে সবচেয়ে কম। আবার মঙ্গলগ্রহে পৌছে ব্যোমযানটিকে যদি মঙ্গলগ্রহের মাটিতে নামাতে হয় তাহলে সেখানেও ব্যোমযানটির বেগ হবে সবচেয়ে আস্তে (১৩নং চিত্র)।



১৩নং চিত্র। অর্ধ-উপবৃত্তাকার গতিপথে মঙ্গলগ্রহে যাত্রা।

আগেই বলা হয়েছে, ব্যোমযানটির যাত্রা শুরু করবার একটি নির্দিষ্ট সময় থাকবে, যখন খুশি তখন ছুট দিলেই চলবে না। অবশ্য সিধে রাস্তায় যদি ছুট দেয় তো আলাদা কথা। ব্যোমযানটি যখন মঙ্গলগ্রহের কক্ষে পৌছবে তখন ব্যোমযানের সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের সাক্ষাৎ হওয়া দরকার (অর্থাৎ সেই বিশেষ মুহূর্তে মঙ্গলগ্রহকেও কক্ষপথের সেই বিশেষ বিন্দুতে থাকতে হবে)। সুতরাং যাত্রা-শুরুর সময়ে পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহের পারস্পরিক অবস্থানগত একটা সম্পর্ক থাকা দরকার; এই বিশেষ সম্পর্কটি মোটামুটি ৭৮০ দিন পরে পরে আসে।

একটি অর্ধ-উপবৃত্তাকার গতিপথ ধরে মঙ্গলগ্রহে যাত্রা করলে মঙ্গলগ্রহে পৌছতে সময় লাগবে ২৫৯ দিন। আবার সেই একই

গতিপথ ধরে মঙ্গলগ্রহ থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হলে যাত্রীদের ৪৫৪ দিন অপেক্ষা করতে হবে। কারণ এই ৪৫৪ দিন পার হলে তবেই পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহ পারস্পরিক অবস্থানগত সঠিক সম্পর্কটিতে পৌছবে।

এই ধরনের একটি গতিপথ ধরে ব্যোমযানকে মঙ্গলগ্রহের দিকে ছুট দেওয়াতে হলে যাত্রা-শুরুর সময়ে ব্যোমযানের বেগ হওয়া দরকার সেকেণ্ডে ১১·৬ কিলোমিটার (৭ মাইলের কিছু বেশী)। অবশ্য ভবিষ্যতের মহাশূন্য-যাত্রীরা এ-ধরনের গতিপথ পছন্দ করবে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। কারণ এ-ধরনের গতিপথে মঙ্গলগ্রহে পৌছতে লম্বা সময় লেগে যাচ্ছে। পৌছবার সময়কে আরো কমাবার জন্য তারা সম্ভবত যাত্রা-শুরুর বেগকে আরো বাড়িয়ে ব্যোমযানকে অধিবৃত্তাকার গতিপথে ছুট দেওয়াবে। ব্যোমযানটি যদি যাত্রা-শুরুর সময়ে সেকেণ্ডে ১৬·৭ কিলোমিটার (প্রায় ১০ মাইল) বেগে ছুট দিতে পারে তাহলে মঙ্গলগ্রহে পৌছতে সময় লাগবে ৭০ দিন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, যাত্রা-শুরুর বেগকে যদি ১·৪ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে পৌছবার সময় কমে যায় ৩·৭ ভাগ। মহাশূন্যে ব্যোমযানের চলাফেরার ব্যাপারে এটি বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

গত শতকের শেষদিকে সাধারণভাবে এমন একটা ধারণা ছিল যে, মঙ্গলগ্রহে উচ্চতর জীব আছে। এ-নিয়ে অনেক গল্প ও উপন্যাস লেখা হয়েছে। কিন্তু লেখকরা এসব গল্প ও উপন্যাসের চরিত্রদের এই দুশ্চিন্তায় ফেলেননি যে কোন্ সময়ে বা কোন্ গতিপথ ধরে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাত্রা শুরু করা যেতে পারে। সময় বা গতিপথের বিষয়টিকে যদি বিবেচনা করতে হয়, তাহলে ব্যাপারটা অনেক বেশী দুরূহ হয়ে ওঠে। এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাত্রা সম্ভব গোটাকতক 'সম্ভাব্য' পথে—তার বাইরে কিছুতেই নয়। এবং এই সম্ভাব্য পথ

ঠিক করার সময়ে দুই গ্রহের পারস্পরিক অবস্থানগত সম্পর্কটিকে বিবেচনা করে দেখতে হবে। সুতরাং, যে-যে তারিখে ব্যোমযান যাত্রা শুরু করতে পারে বা গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারে—তা কড়াকড়ি ভাবে ধরা-বাঁধা।

পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহে বা শুক্রগ্রহে যাত্রার একটা টাইমটেবল্ যদি করা হয় তাহলে দেখা যাবে, এই টাইমটেবলের মধ্যে মস্ত মস্ত ফাঁক বা 'যাত্রা নাস্তি' আছে, যার স্থায়িত্ব কয়েক মাস থেকে দেড় বছর পর্যন্ত হতে পারে। এই সময়ে কোনো ব্যোমযান পৃথিবী থেকে রওনা হবে না বা গন্তব্যস্থানে পৌছবে না, কারণ বিভিন্ন গ্রহের পারস্পরিক অবস্থান এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাত্রার পক্ষে অনুকূল নয়।

শুক্রগ্রহে যাত্রা

সূর্য অস্ত যাবার ঠিক পরেই দিগন্তের দিকে তাকালে প্রায় সময়েই জ্বলজ্বলে একটি তারা দেখা যায়। এইটিই হচ্ছে শুক্রগ্রহ। বছরের কিছুটা সময় এই গ্রহটি ভোর হবার আগে আকাশে ওঠে এবং পরিষ্কার দিনের আলোতেও দেখা যায়। শুক্রগ্রহ সূর্যের খুব কাছে আর আলো ঠিকরে দেবার ক্ষমতা এই গ্রহটির খুব বেশী—এজন্যই গ্রহটি এত জ্বলজ্বলে।

শুক্রগ্রহ হচ্ছে পৃথিবীর সব চেয়ে কাছের প্রতিবেশী। সৌরমণ্ডলের অন্য যে-কোনো গ্রহের চেয়ে এই গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর মিল বেশী।

এই গ্রহের বস্তুপিণ্ড ও আয়তন আমাদের গ্রহের বস্তুপিণ্ড ও আয়তনের চেয়ে মাত্র সামান্য একটু কম। ভবিষ্যতের মহাশূন্য-যাত্রীরা এই গ্রহের মাটিতে নেমে নিজেদের শরীরের ভার সম্পর্কে কোনো রকম অস্বস্তি বোধ করবে না।

১৭৬১ সালে এই গ্রহটিকে সূর্যগোলকের পটভূমিতে দেখা গিয়েছিল। সে-সময়ে মিখাইল লোমোনোসভ দূরবীনের সাহায্যে আবিষ্কার করেছিলেন, একটি জলন্ত চাকৃতি যেন গ্রহটিকে বেড় দিয়ে আছে। ব্যাপারটাকে তিনি এই বলে ব্যাখ্যা করলেন যে শুক্রগ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে। পরবর্তীকালের পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছিল যে সেই জলন্ত চাকৃতিটি ছিল সত্যি সত্যিই গ্রহটির বায়ুমণ্ডল ; সূর্যের আলোয় ওভাবে জলে উঠেছিল। সূর্যগোলকের পটভূমিতে গ্রহটিকে আরেকবার দেখা গিয়েছিল ১৮৮২ সালে এবং এর পরে আবার দেখা যাবে ২০০৪ সালে। কিন্তু ব্যোমযানের বিজ্ঞানীরা বছরের মধ্যে বারকয়েক এ-ব্যাপারটাকে দেখতে পারবেন।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকদিন ধরে ধারণা ছিল যে শুক্রগ্রহের মেঘ হচ্ছে জলীয় বাষ্পের মেঘ আর এই মেঘের আলো ঠিকরে দেবার ক্ষমতা খুব বেশী। কিন্তু পরবর্তীকালে এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরের বাতাস সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে যে সেখানে না আছে জলীয় বাষ্প, না আছে অক্‌সিজেন—তার বদলে আছে বড়ো বেশী মাত্রায় কার্বনিক অ্যাসিড। সম্ভবত এই বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তরের বাতাসও শ্বাসপ্রশ্বাসের পক্ষে অনুপযুক্ত। অতএব যাত্রীদের সঙ্গে মজুদ অক্‌সিজেন থাকা দরকার।

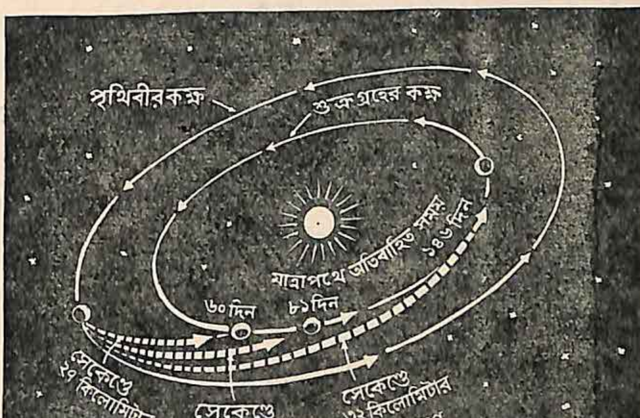
কোনো কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করেন যে শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের কাঠামো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কাঠামোর মতোই।

আবার অনেকে মনে করেন, শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উচ্চতার চেয়ে বেশী। পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে যে শুক্রগ্রহের মাটির ওপরে শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর মাটির ওপরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে দু-তিন গুণ বেশী। তার মানে, ব্যোমযানকে যদি শুক্রগ্রহের মাটিতে নামাতে হয় তাহলে এই বায়ুমণ্ডলের সাহায্যে ব্যোমযানের বেগ কমানো যাবে।

শুক্রগ্রহের আবর্তন-কাল (অর্থাৎ, শুক্রগ্রহ যে লাট্টুর মতো পাক খাচ্ছে তার একটি পুরো পাক খাবার সময়) এখনো সুনির্দিষ্টভাবে স্থির হয়নি। কোনো কোনো গবেষণাকারীর মতো, শুক্রগ্রহের আবর্তন-কাল ৬৮ ঘণ্টা, অনেকে মনে করেন যে শুক্রগ্রহের আবর্তন-কাল আর পৃথিবীর আবর্তন-কাল সমান (অর্থাৎ, ২৪ ঘণ্টা)। এ ছাড়াও একদল আছেন যাঁদের ধারণা, সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে শুক্রগ্রহের যতোদিন সময় লাগে শুক্রগ্রহের আবর্তন-কাল ততোদিন, অর্থাৎ ২২৫ দিন। শুক্রগ্রহের বিষুবরেখা কক্ষ-সমতলের ওপরে কতটা কোণাকুণি রয়েছে (অর্থাৎ, শুক্রগ্রহ কক্ষ-সমতলের ওপরে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে আছে না খানিকটা হেলে আছে) তা এখনো জানা যায়নি ; এরই ওপরে নির্ভর করে সারা বছরে দিন ও রাত্রির মাপ কি হবে। মহাশূন্যের যাত্রীরা যতোদিন না শুক্রগ্রহের চারদিকে ঘুরে আসতে পারে ততোদিন এসব প্রশ্নের জবাব জানা যাবে বলেও মনে হয় না। এ সমস্ত তথ্য হাতে এলে আমরা হিসেব করতে পারব, ব্যোমযানকে শুক্রগ্রহের মাটিতে নিরাপদে নামাবার জন্য কতখানি উঁচু থেকে আর কোন্ দিক থেকে শুক্রগ্রহের মাটিতে ঝাঁপ দিতে হবে। শুক্রগ্রহকে ঘিরে যে বায়বীয় মণ্ডলটি আছে তার তুলনায় ব্যোমযানের বেগ যতো কম হবে ততোই নিরাপদে ব্যোমযানটি শুক্রগ্রহের মাটিতে নামতে

পারবে। ব্যোমযানটি যেদিকে ছুটছে আর শুক্রগ্রহ যেদিকে লাট্টুর মতো পাক খাচ্ছে, এ-তুটো একই দিকে কিনা তার ওপরে ব্যোমযানের বেগ (অর্থাৎ, আপেক্ষিক বেগ—যে বেগে ব্যোমযানটি শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলে ঝাঁপ দেবে) অনেকখানি নির্ভর করে।

গোড়ার দিকের কয়েকটি অভিযান চালানো হবে শুক্রগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য। এ সমস্ত পর্যবেক্ষণের ফলে খুঁটিয়ে জানা যাবে, শুক্রগ্রহে মাটির গড়ন কি রকম এবং শুক্রগ্রহে উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে কিনা। গ্রহটিকে ঘিরে মেঘের যে ঘেরাটোপ আছে তার ফলে গ্রহের উপরিতলকে সরাসরি দেখা যায় না। কিন্তু ইন্‌ফ্রা-রেড রশ্মির সাহায্যে ফটো তোলার যে নতুন পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিতে ফটো



১৪নং চিত্র। অর্ধ-উপবৃত্তাকার গতিপথে শুক্রগ্রহে যাত্রা

তুললে মেঘ থাকা সত্ত্বেও ব্যোমযান থেকে শুক্রগ্রহের উপরিতলের ফটো তুলে নেওয়া যাবে।

মনে করা যাক, ব্যোমযানে চেপে আমরা শুক্রগ্রহে চলেছি (১৪নং চিত্র)। সেকেণ্ডে ১১·৫ কিলোমিটার (সাত মাইলের কিছু বেশী) বেগে পৃথিবী থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। ব্যোমযানের চালক ব্যোমযানের মোটর বন্ধ করে দিয়েছে আর এখন গুল্‌তি-দিয়ে-ছোঁড়া ঢিলের মতো ব্যোমযানটি নিজস্ব গতিবেগেই মহাশূন্যে ছুট দিয়েছে। ব্যোমযানের যাত্রীদের মনে হচ্ছে, তাদের শরীরের কোনো ভার নেই। ব্যোমযানের জানলা দিয়ে তারা বাইরের দিকে তাকায়। বাইরে দেখা যাচ্ছে আলকাতরার মতো কালো মহাশূন্যে সবুজাভ-নীল একটি গোলক আস্তে আস্তে পাক খাচ্ছে—এই গোলকটিই আমাদের পৃথিবী। সূর্যের আলো পড়েছে পৃথিবীর ওপরে আর সেই আলোয় মেঘের ফাঁক দিয়ে মহাদেশগুলোর রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বাইরে চলে এসেছে ব্যোমযানটি আর এখন ক্রমেই পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

কয়েক মাস কাটে। পৃথিবী অনেক আগেই হয়ে উঠেছে একটা ছোট্ট জ্বলজ্বলে নীল্‌চে বস্তু। সূর্যের তাপ হয়ে উঠেছে আরো তীব্র। আর দেখা যাচ্ছে, এক নতুন অজানা জগৎ নীল্‌চে-সাদা আলোর ঝলক তুলে পলকে পলকে এগিয়ে আসছে। এই হচ্ছে শুক্রগ্রহ। চোখের সামনে গ্রহটি ক্রমেই বড়ো হতে থাকে, আর যতোই বড়ো হয় ততোই বেশী বেশী সংখ্যায় মহাকাশের তারাগুলো চোখের আড়ালে চলে যায়। এবারে ব্যোমযানটি যাতে মস্ত একটি উল্কাপিণ্ডের মতো শুক্রগ্রহের মাটিতে আছড়ে না পড়ে সেজন্য ব্যোমযানের বেগ কমাতে হবে। ব্যোমযানটি যদি সত্যিই উল্কাপিণ্ডের মতো শুক্রগ্রহের মাটিতে

আছড়ে পড়ত তাহলে একটি বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে ব্যোমযানের গতিশক্তি রূপান্তরিত হত তাপশক্তিতে এবং তার ফলে ব্যোমযানের ধাতু ও অন্য সমস্ত কিছু ধোঁয়া হয়ে উড়ে যেত এবং শুক্রগ্রহের মাটিতে মস্ত একটি গর্ত ছাড়া ব্যোমযানের চিহ্নমাত্র থাকত না।

কিন্তু ব্যোমযানের চালক ব্যোমযানকে মাটিতে আছড়ে পড়তে দেয়নি। চালকের দক্ষতায় ব্যোমযানটি শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে জমির প্রায় সমান্তরালভাবে। তখন বাতাসের বাধা পেয়ে পেয়ে ব্যোমযানের বেগ খানিকটা কমে। তারপর ব্যোমযানের চালক ব্যোমযানের মুখের দিকের উল্টো-ধাক্কা-দেবার রকেটগুলোকে চালু করে দেয়, ফলে ব্যোমযানের বেগ কমে গিয়ে প্রায় থেমে যাবার মতো অবস্থা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যোমযানটি নিরাপদে মাটিতে নেমে আসে।

বিজ্ঞানীদের দিন কাটে নানা রকম পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে, নানা কৌতূহলজনক নমুনা সংগ্রহ করে, নানা ধরনের গবেষণা করে। শেষকালে ফিরে যাবার নির্দিষ্ট তারিখটি আসে। ব্যোমযানটি সেকেণ্ডে ১০·৭ কিলোমিটার (সাড়ে ছয় মাইল) বেগে যাত্রা শুরু করে এবং শুক্র ও পৃথিবীর কক্ষপথের বরাবর (tangent) একটি অর্ধ-উপবৃত্তাকার পথে ছুট দেয়। ব্যোমযানটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে সেকেণ্ডে ১১·৫ কিলোমিটার বেগে। এই বেগকে ঠেকাবার জন্য ব্যোমযানটি প্রথমে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে ভেসে বেড়াবে, তারপরে নিচের ঘন স্তরে।

পৃথিবী থেকে যাত্রা করে শুক্রগ্রহে পৌছতে সময় লাগবে ১৪৬ দিন। তবে পৌছবার সময়কে কমিয়ে ৮১ বা ৬০ বা তার চেয়েও কম করা যায় (১৪নং চিত্র)

পৃথিবীতে আমরা দেখি, বেগ যতো বাড়ে পৌঁছবার সময় ততো কমে। যেমন একটি ঢিল। ঢিল যতো জোরে ছোঁড়া হবে ততো তাড়াতাড়ি ঢিলটি লক্ষ্যবস্তুকে ঘা দেবে। কিন্তু এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাত্রার ব্যাপারে এই নিয়ম সব সময়ে খাটে না। শুক্রগ্রহে যাত্রার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে পৃথিবীর সঙ্গে তুলনাগত বিচারে ব্যোমযানের যাত্রা-শুরুর বেগ যতো বেশী হবে, সূর্যের সঙ্গে তুলনাগত বিচারে ব্যোমযানের বেগ হবে ততো কম।* এর কারণ, পৃথিবী যেদিকে ছুটছে, ব্যোমযানটি ছুটবে তার উল্‌টো দিকে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। মনে করা যাক, একটি চলন্ত ট্রেনের যাত্রী ট্রেনের গতির উল্‌টো দিকে হাঁটছে; লোকটি যতো জোরে হাঁটতে পারবে ততোই জমির সঙ্গে তুলনাগত বিচারে তার বেগ কমবে।

মহাশূন্যে ব্যোমযানের ছোটার বেগ কমে গেলে কেন ব্যোমযানটি আরো কম সময়ের মধ্যে শুক্রগ্রহে পৌঁছবে তা বোঝা যাবে ১৪নং চিত্রের দিকে তাকালে। ব্যাপারটা কিভাবে ঘটছে তা এই চিত্রে দেখানো হয়েছে। চিত্রে ব্যোমযানের যে তিনটি বেগ দেখানো হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে কম বেগে ব্যোমযানটি যখন

---

* পৃথিবী সেকেণ্ডে ১৯ মাইল বেগে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমযানটিও ঘুরছে; সুতরাং যাত্রা-শুরুর আগে সূর্যের তুলনাগত বিচারের ব্যোমযানের বেগ সেকেণ্ডে ১৯ মাইল। এবারের ব্যোমযানটি যদি সেকেণ্ডে ৭ মাইল বেগে পৃথিবীর গতির উল্‌টো দিকে যাত্রা শুরু করে তাহলে সূর্যের তুলনাগত বিচারে ব্যোমযানটির বেগ হয়ে যায় সেকেণ্ডে ১২ মাইল। ব্যোমযানের বেগ যদি সেকেণ্ডে ৭ মাইলের বেশী হয় তাহলে সূর্যের তুলনাগত বিচারে ব্যোমযানের বেগ সেকেণ্ডে ১২ মাইলের কম হবে।

—বাংলা অনুবাদক

ছুট দেয় তখন ব্যোমযানটিকে পার হতে হয় সবচেয়ে কম দূরত্ব। ফলে শুক্রগ্রহে পৌছবার সময় কমিয়ে ফেলা সম্ভব হয়।*

অন্যান্য গ্রহে যাত্রা

পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি প্রতিবেশী যারা—অর্থাৎ চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গল—সেখানে যেতে হলে কি কি অবস্থার মধ্যে যাত্রা করতে হবে তার বিবরণ আমরা দিয়েছি। সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহে যাওয়া আরো অনেক বেশী দুরূহ ব্যাপার।

আমরা দেখেছি, পৃথিবী থেকে অন্য কোনো গ্রহে যাত্রা করতে হলে যাত্রা-শুরুর বেগ কি হবে তা নির্ভর করবে কোন্ বিশেষ রাস্তায় ব্যোমযানকে ছুট দেওয়ানো হবে তার ওপরে। এই বিচারে অর্ধ-উপবৃত্তাকার গতিপথটি হচ্ছে খরচের দিক থেকে সবচেয়ে সুবিধের। এবার তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহে পৌছতে হলে যাত্রা-শুরুর সবচেয়ে কম বেগ কি? কতদিন লাগবে গন্তব্যস্থানে-পৌছতে? এসমস্ত প্রশ্নের জবাব পরের পৃষ্ঠার ছক-কাটা হিসেব থেকে পাওয়া যাবে।

---

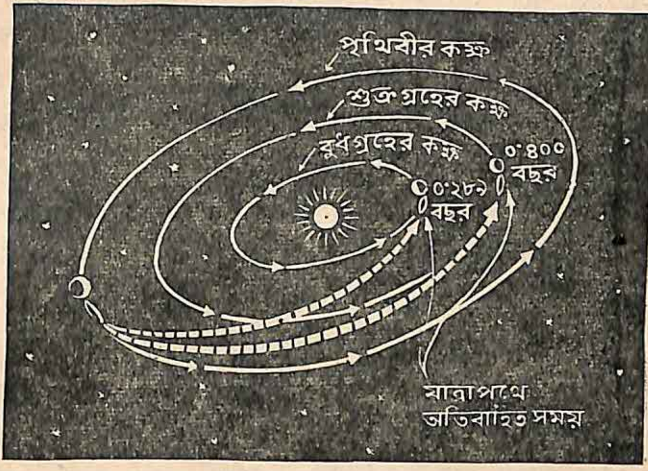
* মনে রাখা দরকার যে একমাত্র শুক্র বা বুধগ্রহের বেলাতেই এ-ব্যাপার সম্ভব, কারণ এই দুটি গ্রহ রয়েছে সৌরমণ্ডলে পৃথিবীর চেয়েও ভেতরের দিকে; তার মানে, সূর্য থেকে পৃথিবী যতোটা দূরে তার চেয়েও কম দূরে আছে এই দুটি গ্রহ।

—বাংলা অনুবাদক

যে গ্রহের দিকে ব্যোমযান ছুটছে	সবচেয়ে কম যাত্রা-শুরুর বেগ (সেকেণ্ডে কিলোমিটার)	অতিবাহিত সময় (এক তরফা)	
		বছর	দিন
বুধ	১৩·৫	—	১০৫
শুক্র	১১·৫	—	১৪৬
মঙ্গল	১১·৬	—	২৫৯
বৃহস্পতি	১৪·২	২	২৬৭
শনি	১৫·২	৬	১৮
ইউরেনাস ...	১৫·৯	১৬	১৪
নেপচুন	১৬·২	৩০	২২৫
প্লুটো	১৬·৩	৪৫	১৪৯

এই ছক-কাটা হিসেব থেকে দেখা যাবে, একটি অর্ধ-উপবৃত্তাকার পথ ধরে শুক্রগ্রহে যেতে যতোটা সময় লাগছে তার চেয়ে কম সময় লাগছে বুধগ্রহে যেতে, যদিও বুধগ্রহ পৃথিবীর যতোটা কাছাকাছি আসে তার চেয়ে অনেক বেশী কাছাকছি আসে শুক্রগ্রহ। কথাটা শুনে গোড়ায় ব্যাপারটাকে খুবই গোলমেলে মনে হতে পারে। কিন্তু ১৫নং চিত্রের দিকে তাকালে বোঝা যাবে এ-ব্যাপার কি করে সম্ভব হচ্ছে। ছবিতে দেখা যাবে, পৃথিবী থেকে বুধগ্রহে যাবার রাস্তা পৃথিবী থেকে শুক্রগ্রহে যাবার রাস্তার চেয়ে ছোট।

পৃথিবী থেকে মঙ্গল যতোটা দূরে তার অনেক গুণ বেশী দূরে বৃহস্পতি। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে একটা এলাকা আছে যেখানে অসংখ্য গ্রহাণু আছে ; এগুলো ব্যোমযানের পক্ষে বিপদ্জনক।



১৫নং চিত্র। অর্ধ-উপবৃত্তাকার পথে বুধগ্রহে পৌঁছতে যতো সময় লাগবে তার চেয়ে বেশী সময় লাগবে শুক্রগ্রহে পৌঁছতে।

বৃহস্পতিগ্রহে সূর্যের আলো সামান্যই পৌঁছয়। তাছাড়া, বৃহস্পতি-গ্রহের ওপরে অধিবৃত্ত-বেগ পৃথিবীর ওপরে অধিবৃত্ত-বেগের চেয়ে পাঁচগুণেরও বেশী। বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রায় তিনগুণ। এই সমস্ত অসুবিধের জন্য নভোচারণবিদ্‌দের পক্ষে এই গ্রহে থাকা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া অন্য বাধাও আছে, যেমন বিষাক্ত গ্যাস আর শীত। সে যাই হোক, ব্যোমযানকে বৃহস্পতির একটি কৃত্রিম উপগ্রহের মতো পাক খাইয়ে দিয়ে বৃহস্পতিকে পর্যবেক্ষণ করা চলবে।

বুধগ্রহের দিকে যাত্রা শুরু করার আগে মনে রাখতে হবে, এই গ্রহটির সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে যতো সময় লাগে ঠিক

ততো সময় লাগে নিজের অক্ষের ওপরে একবার পাক খেতে (৮৮ দিন)। ফলে, গ্রহটির এক গোলার্ধ সবসময়েই থাকে সূর্যের দিকে আর অপর গোলার্ধে অন্ধকারের চির-রাজত্ব। এজন্য এই অন্ধকার গোলার্ধে উত্তাপ খুবই কম। এই দুই গোলার্ধকে পৃথক করেছে সরু একটি ফালি যেখানে সবসময়েই প্রদোষ এবং যেখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। 'আবহাওয়া' শব্দটা ব্যবহার করলাম বটে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তা নিতান্তই আলংকারিক অর্থে, কারণ যতোদূর জানা যায়, এই গ্রহে ছিটেফোঁটা বাতাসও নেই।

বুধগ্রহে সূর্যকিরণের গড়পড়তা তেজ পৃথিবীতে সূর্যকিরণের তেজের চেয়ে সাতগুণ বেশী। বুধগ্রহের যে গোলার্ধ সূর্যের দিকে আছে সেই গোলার্ধের উত্তাপ খুবই বেশী ; ৪০০° সেন্টিগ্রেড। এই গ্রহে যাত্রা করতে হলে ব্যোমযানের খোলস এমন হওয়া চাই যেন সূর্যকিরণের বেশীর ভাগটাই এই খোলস থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যায়।

বুধগ্রহের মাটিতে ব্যোমযানকে নামাতে হলে রকেট-ব্রেক* ছাড়া উপায় নেই। তবে এভাবে নামতে যাওয়া খুবই অসুবিধের।

শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর দিকে পাড়ি দেবার জন্য যেপথে রওনা হলে সবচেয়ে কম যাত্রা-শুরুর বেগ দরকার তাতে গন্তব্য স্থানে পৌছতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। কাজেই এসব গ্রহে যেতে হলে অমিত শক্তিশালী 'এক্স্‌প্রেস' রকেট তৈরি করতে হবে। একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক। প্লুটোগামী একটি ব্যোমযানের যাত্রা-শুরুর বেগকে

---

* ব্যোমযান যেদিকে ছুটছে, রকেটের মোটরকে চালু করতে হবে তার উল্‌টো দিকে ; তার ফলে তৈরী হবে একটি উল্‌টো ধাক্কা যা ব্যোমযানের বেগ কমিয়ে দেবে।—বাংলা অনুবাদক

যদি শতকরা পাঁচ ভাগ বাড়িয়ে সেকেণ্ডে ১৬·৭ কিলোমিটারের মাপে আনা যায়, তাহলে গন্তব্যস্থানে পৌছতে স্বাভাবিক ক্ষেত্রে যা সময় লাগার কথা এক্ষেত্রে লাগবে তার অর্ধেকেরও কম।

যদিও এই গ্রহগুলোর মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রায় সমান তবু তাদের প্রাকৃতিক অবস্থা মানুষের পক্ষে অনুপযুক্ত। নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে এই গ্রহগুলোর বায়ুমণ্ডলে আছে প্রধানত মিথেন গ্যাস আর এই গ্রহগুলোর উপরিতলের উত্তাপ খুবই কম।

পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি যেসব নক্ষত্র আছে—সেখানে যাত্রা করা কি সম্ভব ?

যদি আমরা এই চাঁদোয়ার মতো আকাশটাকে খালি চোখে খুঁটিয়ে দেখি, তাহলে গ্রহ আর নক্ষত্রের মধ্যে কোনো তফাৎ বুঝতে পারব না। মনে হবে, গ্রহ আর নক্ষত্র দুই-ই পৃথিবী থেকে সমান দূরে রয়েছে। আসলে কিন্তু তা নয়। গ্রহ থেকে নক্ষত্র অনেক অনেক গুণ দূরে। আমাদের সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে দূরের গ্রহ প্লুটো; সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো পৌছতে সময় লাগে প্রায় সাত ঘণ্টা (আলোর বেগ সেকেণ্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার বা ১,৮৬,০০০ মাইল)। আর আকাশে যেসব নক্ষত্র দেখা যায় তাদের মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আলো পৌছতে সময় লাগে চার বছরেরও বেশী। সুতরাং নক্ষত্রের দেশে পাড়ি দেওয়াটা সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার।

পরিশিষ্ট

এই পুস্তিকায় আমরা পাঠকের কাছে নভোচারণবিদ্যার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা আভাস দেবার চেষ্টা করেছি।

নভোচারণাকে সম্ভব করতে হলে রকেটকে এখন যতোটা বেগে ছুট দেওয়ানো যাচ্ছে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশী বেগে ছুট দেওয়াতে হবে। চন্দ্রে এবং সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহে পৌঁছতে হলে রকেটের বেগ সেকেণ্ডে ১১·১ কিলোমিটার থেকে ১৬.৩ কিলোমিটারের মধ্যে হওয়া চাই।

একটি স্পেস-স্টেশন গড়ে তুলতে পারলে মহাশূন্যে যাত্রার ব্যাপারটি অনেক সহজ হয়ে যায়। ব্যোমযানটিকে তাহলে দু-ধাপে প্রয়োজনীয় বেগে ছুট দেওয়ানো যেতে পারে। প্রথম ধাপে পৃথিবী থেকে যাত্রা-শুরুর সময়ে ব্যোমযানটির বেগ হবে চক্র-বেগ* অর্থাৎ সেকেণ্ডে ৭·৯ কিলোমিটার। দ্বিতীয় ধাপ শুরু হবে স্পেস-স্টেশন থেকে ; তখন ব্যোমযানটিকে সেকেণ্ডে তিন বা চার কিলোমিটারের বাড়তি বেগ দেওয়া হবে।

মহাশূন্যে যাতায়াত করতে হলে যে-বেগ দরকার তা সম্ভব করে তোলার জন্য রকেটের কলকব্জাকে আরো উন্নত করতে হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, নিষ্ক্রমণ বেগ বাড়াতে হবে। হাল আমলের তরল-জ্বালানির রকেটে সেকেণ্ডে ২·৫ কিলোমিটার বেগে রকেট থেকে

---

* এমন একটি বেগ যার ফলে ব্যোমযানটি কৃত্রিম উপগ্রহের মতো পৃথিবীকে পাক খাবে।—বাংলা অনুবাদক

গ্যাস বেরিয়ে আসে। এই বেগকে বাড়িয়ে সেকেণ্ডে চার কিলোমিটার করা সম্ভব হতে পারে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে—রকেটের ওজনের তুলনায় জ্বালানির ওজন।

হাল আমলের তরল-জ্বালানির রকেটে জ্বালানির ওজন রকেটের ওজনের প্রায় পাঁচ গুণ। আশা করা যায়, নতুন উপকরণ ব্যবহার করে আর রকেটের গড়নকে নিখুঁত করে তুলে এই অনুপাতকে দ্বিগুণ করা যাবে।

রকেটের মোটরকে আরো শক্তিশালী করা আর রকেটের ধাপের সংখ্যা আরো বাড়ানো—এই হচ্ছে আধুনিক রকেটবিদ্যার একটা ঝোঁক।

পৃথিবী থেকে যতো দূরে যাওয়া যাবে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ততো দ্রুত কমবে। এই কারণেই রকেটের যাত্রা-শুরুর বেগকে সামান্য একটু বাড়াতে পারলেই রকেটের পাল্লা অনেকটা বেড়ে যায়। সুতরাং রকেটের পাল্লা বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে প্রত্যেকটি নতুন রেকর্ডকে আগেরটির তুলনায় মস্ত অগ্রগতি বলতে হবে।

মহাশূন্যে প্রথম যে রকেটটি পাড়ি দেবে তা সম্ভবত তাপ-রাসায়নিক জ্বালানির হবে। কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে পরবর্তী কালে সে জায়গায় আসবে পরমাণবিক ব্যোমযান, যার উৎকর্ষ আগেকার রকেটের চেয়ে অনেক বেশী। পরমাণবিক তেজের ব্যবহার নভোচারণবিদ্যার ক্ষেত্রে বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে।

পরমাণবিক রকেট ব্যবহার করে চন্দ্রে বা অন্যান্য গ্রহে এক নাগাড়ে যাওয়া সম্ভব হবে; নতুন করে জ্বালানি নেবার জন্য অন্তর্বর্তী কোনো স্পেস-স্টেশনে যাত্রাভঙ্গ করতে হবে না। রকেট-ব্রেক ব্যবহার করে

পরমাণবিক ব্যোমযান বায়ুমণ্ডলশূন্য গ্রহে বা উপগ্রহে নামতে পারবে এবং সৌরমণ্ডলের যে কোনো গ্রহ থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে। আর শেষ কথা হলেও তুচ্ছ কথা নয় যে, বিভিন্ন গ্রহের পারস্পরিক অবস্থান সবচেয়ে অনুকূল অবস্থায় আসার জন্য পরমাণবিক ব্যোমযানকে অপেক্ষা করতে হবে না; যে-কোনো সময়ে যাত্রা শুরু করতে পারবে।

ব্যোমযানের বেগ তৈরী হয়ে যাবার পরে ব্যোমযানটি জ্বালানি বাঁচাবার জন্য নিজস্ব গতিবেগে ছুট দেবে, আর এই একই কারণে ব্যোমযানটি সিধে রাস্তা ধরে মহাশূন্যে ছুট দেবে না। ব্যোমযানটির গতিপথ হবে প্রথমে উপবৃত্ত ও পরে অধিবৃত্ত বা পরাবৃত্ত।

গোড়ার দিকে, রকেটের যাত্রী হিসেবে মানুষের রওনা হবার মতো অবস্থা তৈরী হবার আগে, মহাশূন্যে যেসব রকেট ছুটবে তাতে মানুষ থাকবে না; তা হবে বেতার-নিয়ন্ত্রিত। ব্যোমযান তৈরি করার জন্য যেসব তথ্য জানা দরকার তা জানা যাবে এসব রকেট থেকে, আর প্রাণীদেহের ওপরে মহাশূন্য-পর্যটনের ফল কি হতে পারে তা পরীক্ষা করা হবে এসব রকেটে।

গ্রহ থেকে গ্রহে যাতায়াত শুরু হবার প্রথম ধাপ হিসেবে তৈরী হবে পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ, তারপরে পাড়ি দেওয়া হবে চন্দ্রে ও অন্যান্য গ্রহে।

পৃথিবীকে একবার পাক দিতে দেড় ঘণ্টার বেশী সময় লাগবে না। পৃথিবী থেকে রওনা হয়ে চন্দ্রকে একপাক ঘুরে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে সময় লাগবে দশ দিন। আর যদি এমন একটি উপবৃত্তাকার গতিপথ বেছে নেওয়া হয় যা শুক্র ও মঙ্গলের কক্ষকে ছেদ করবে, তাহলে সেই গতিপথ ধরে পৃথিবী থেকে রওনা হয়ে আবার ফিরে আসতে

সময় লাগবে অন্তত এক বছর। আরো দূরের রাজ্যে পাড়ি দিতে হলে সময় লাগবে কয়েক বছর।

আধুনিক রেডিও ইঞ্জিনীয়ারিং বেতার-তরঙ্গকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমূখী করতে পারে। এই ব্যবস্থার সাহায্যে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে। মহাশূন্যে ছুটন্ত রকেটটি ঠিক কোন্ জায়গায় আছে তা সহজেই হিসেব করে নেওয়া যাবে; কারণ নভোলোকের অন্যান্য বস্তু যে-নিয়ম মেনে চলে রকেটটিকেও সেই একই নিয়ম মেনে চলতে হবে।

যতোদূর বোঝা যাচ্ছে, মহাশূন্যে যাত্রার পক্ষে মানুষের শরীরের দিকে থেকেও কোনো বাধা নেই। যাত্রা-শুরুর পরে মাত্র কয়েক মিনিট রকেটের মোটর চালু থাকবে—তার মানে, খরচের দিক থেকে সবচেয়ে সুবিধের এমন একটি অবস্থায় রেখে রকেটের মধ্যে মহাশূন্যে ছুট দেবার মতো বেগ তৈরি করা যাচ্ছে। যাত্রা-শুরুর পরে এই প্রথম কয়েক মিনিটে বাড়তি চাপ পড়বে মানুষের শরীরের ওপরে। একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে মানুষ নিজের শরীরের ওজনের চার-পাঁচ গুণ বেশী বাড়তি চাপ সহ্য করতে পারবে।

তারপরে আছে ভারশূন্য অবস্থা। একথা এখনো নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায়নি যে দীর্ঘকাল ধরে কম-বেশী একটানা ভারশূন্য অবস্থায় থাকাটা মানুষের শরীরে পক্ষে অনিষ্টকর। আর যদি প্রমাণ পাওয়া যায়ও যে ভারশূন্য অবস্থাটা মানুষের শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর, তাহলে তার পাল্টা ব্যবস্থা আছে—ব্যোমযানকে পাক খাইয়ে দিয়ে কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণের টান তৈরি করাটা যান্ত্রিক দিক থেকে খুবই সম্ভব।

ব্যোমযানের ধাতু-মোড়কটি সূর্যের তেজকে কম-বেশী শুষে নিতে পারবে এবং ব্যোমযানের ভেতরের বাতাসের উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত হবে ব্যোমযানের এই ধাতু-মোড়কটির সাহায্যে।

ব্যোমযানের ভেতরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের একটি ক্ষুদে সংস্করণ তৈরি করা, অর্থাৎ বাতাসের উপাদানগত গড়ন ও আর্দ্রতা এমন করে তোলা যাতে মানুষের উপযুক্ত হয় ; ব্যোমযানের যাত্রীদের জন্য খাদ্য যোগান দেওয়া ; সূর্যের আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিকে ঠেকিয়ে রাখা—এসব কাজ যে যান্ত্রিক দিক থেকে বিশেষ একটা শক্ত কাজ তা নয়, বর্তমান অবস্থায় যন্ত্রবিদ্যার যতোটুকু উন্নতি হয়েছে তাতেই তা সম্ভব। মহাজাগতিক রশ্মি মানুষের শরীরের পক্ষে কতখানি অনিষ্টকর তা নিয়ে গবেষণা চলছে। উল্কাপিণ্ড ও গ্রহাণুপুঞ্জ যে ব্যোমযানের পক্ষে খুবই বিপদ্‌জনক এই কথাটিকেও মনে রাখতে হবে।

একেবারে শেষের দিকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেসব সাফল্য লাভ হয়েছে তা থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা চলে যে এই শতাব্দীর মধ্যেই গ্রহে গ্রহে যাতায়াত সম্ভব হয়ে উঠবে। মানুষের এক বিরাট স্বপ্ন—যে স্বপ্নকে অল্প কিছুকাল আগেও উদ্ভট আখ্যা দেওয়া হত—তা এতদিনে সত্য হয়ে উঠছে।

আমাদের সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহে প্রাণী আছে কি নেই, যদি থাকে তো তা কতখানি উন্নত—এ প্রশ্নের জবাব এতদিন পাওয়া যায়নি। গ্রহে-গ্রহে যাতায়াত শুরু হলে এ-প্রশ্নের ওপরে আলোকপাত হবে।

মহাশূন্যে পর্যটন নিছক বিজ্ঞানের দিক থেকে খুবই কৌতূহলের ব্যাপার, কিন্তু তা ছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রেও তার একটি দাম হয়তো থাকবে, যদিও আগে থেকেই স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয় যে কিভাবে থাকবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে শুধু একটি বিষয়ের উল্লেখ করা চলে। গ্রহ-উপগ্রহগুলো খনিজ সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার, মানুষের মঙ্গলের জন্য এই খনিজ সম্পদ সম্পর্কে জানতে হবে ও এই খনিজ সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে।

গ্রহে গ্রহে যাতায়াত করার জন্য মহাশূন্যে অন্তর্বর্তী স্টেশন ও ব্যোমযান তৈরি করবে সোভিয়েতের মানুষ,—যাতে বিশ্বরহস্যের কিছুই আর অজানা না থাকে, যাতে পঞ্চভূতের ওপরে মানব-বোধির আধিপত্য বিস্তৃততর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।



এই বইয়ে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় স্তার্নফেল্দ্ ব্যাখ্যা করেছেন, পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ কেন তৈরী হবে, কেমন করে হবে, আর তৈরী হবার ফল কি হবে। এই বইটি পড়লে বোঝা যাবে, পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করাটা বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনা নয়—এক দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার গোড়ার দিকের একটা ধাপ। তবে খুবই দুরূহ ধাপ। আর পৃথিবীর আকাশে দু-দুটি স্পুটনিক সাক্ষ্য দিচ্ছে যে এই সবচেয়ে দুরূহ ধাপটিতে মানুষের জয় শুরু হয়েছে। এজন্যই স্পুটনিক হচ্ছে বিজ্ঞানে নতুন এক যুগেরও সূচনা, যে-যুগে মানুষ নভোচারী হয়ে গ্রহ থেকে গ্রহে পর্যটন করবে। এই নতুন যুগকে বিজ্ঞানের ছক্-কাটা হিসেবের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ে। গ্রহ থেকে গ্রহে পর্যটন কেমন করে হবে আর কিভাবে হবে তার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দিকের সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ ও প্রাঞ্জল আলোচনা এই বইটি।